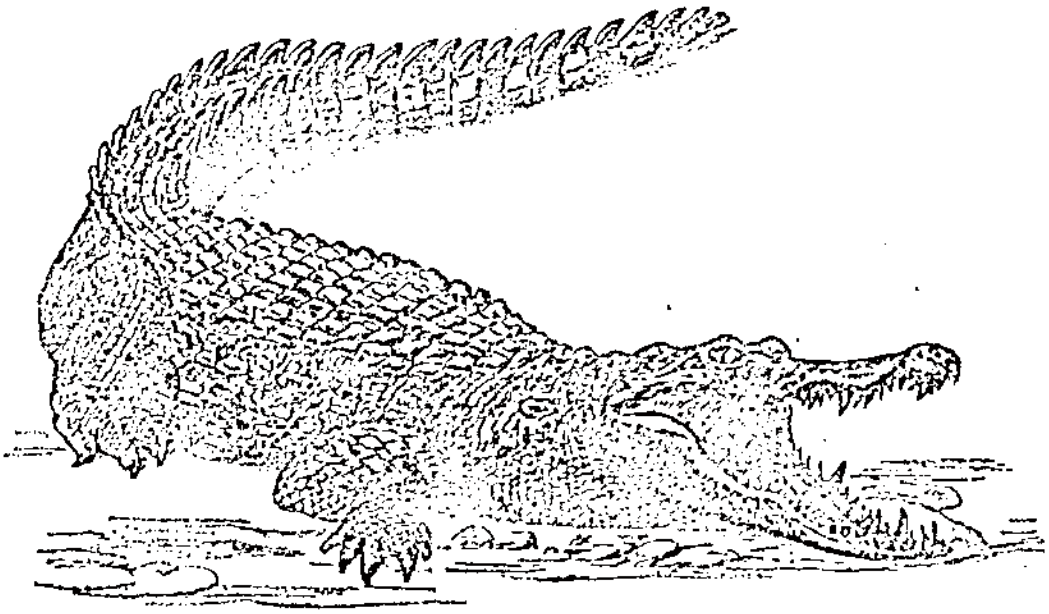

নদের চাঁদ উপাখ্যান

ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলার কুনবাহা ইউনিয়নের কামার হিলা মৌজা। গ্রামটির পাশ দিয়েই বয়ে গেছে মধুমতী নদী। এই নদীর একটি ঘাটের নাম 'নদের চাঁদ ঘাট'। ঘাটটিকে নিয়ে প্রচলিত রয়েছে একটি কিংবদন্তী–স্ত্রীর অনুরোধে একজন মানুষের কুমিরে পরিণত হওয়ার সেই করুণ কাহিনি আজও এ অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে ঘুরে ফিরে।

নদের চাঁদ কোনো জমিদার বা তার সময়ে স্থানীয় কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল না, বরং এক অতি সাধারণ ঘরের ছেলে ছিল। তা সত্ত্বেও তার নামেই নামকরণ করা হয়েছে মধুমতী নদীর একটি ঘাটের। শুধু তাই নয়, তার নামে রয়েছে একটি ডাকঘর এবং স্কুল। কিন্তু কেনই বা এই নামকরণ? এত কিছুর পেছনে রয়েছে করুণ গল্প। ঠিক গল্প নয়, বরং এই অঞ্চলের মানুষ একে সত্যিকারের ঘটনা বলেই মেনে আসছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। সেই কাহিনিটিই আপনাদেরকে এখন বলবো।

বহুকাল আগের কথা। এ অঞ্চলে একসময় গদাধর নামে এক জেলে বাস করতো। স্ত্রীকে নিয়ে ছোট্ট সংসার তার। জেলে পাড়ার ছোট্ট ঝুপড়ীতে থাকে সে। মধুমতী নদীতে মাছ ধরে। সেই বিক্রি করে বাজারে। এতে যা আয় হয় তা দিয়ে কোনোরকমে দিন ঠিকই চলে যেত। কিন্তু সংসারটি আর দুজনের ছোট্ট সংসারে আবদ্ধ থাকছে না। শীঘ্রই তাদের ঘর আলো করে

আসতে চলেছে একজন নতুন অতিথি। তাদের জন্য একদিকে এটা যেমন আনন্দের, সেই সাথে দুশ্চিন্তারও। নতুন অতিথি মানেই নতুন একটা মুখ। আর নতুন একটা মুখের সাথে সাথে যোগ হয় নতুন নতুন চাহিদা।

ঋতুর পালা বদল চলতে থাকে আপন গতিতে। পালা বদলের সেই খেলায় গ্রীষ্মের পর এলো বর্ষা। সেই সাথে ঘনিয়ে আসে গদাধর আর তার স্ত্রীর প্রথম সন্তানটির ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়। এদিকে ভরা বর্ষা মৌসুম হলো মাছ ধরার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। তাই সেই সময়কে সামনে রেখে জেলে পাড়ার সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো নদীতে মাছ ধরতে যাওয়ার আগের বিভিন্ন প্রস্তুতিগুলো সম্পন্ন করে নিতে। বসে নেই গদাধরও। জেলে পাড়ার অন্য সবার মতো সেও ঠিক করে মাছ ধরতে যাবে নদীতে। যদিও তাতে বাধ সাধে তার স্ত্রী। তার কাছে মনে হয় সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে যদি সে মরে যায়, আর গদাধর যদি সেই সময় তার পাশে না থাকে তাহলে আর কখনোই তাকে দেখা হবে না। কিন্তু তারপরেও গদাধর নিজের সিদ্ধান্ত বদলালো না। পরিবারে একজন নতুন অতিথি আসছে। এ সময় চুপচাপ ঘরে বসে থাকলে চলে না। স্ত্রীকে অভয় দেয় সে। আসন্ন ভবিষ্যতের ব্যাপারে বুঝায়। একসময় তার কথা মেনে নেয় তার স্ত্রী।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মাছ ধরার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে একটা ভালো দিন দেখে পাড়ার অন্যান্য জেলেদের সাথে গদাধরও মাছ ধরার উদ্দেশ্যে মধুমতী নদীতে নৌকা ভাসায়। নদের চাঁদের তখনো মাতৃগর্ভে-পৃথিবীর আলো দেখবে দেখবে করছে।

গদাধর মাছ ধরতে চলে যাওয়ার পর তার স্ত্রীর দিনের বেশিরভাগ সময় কেটে যায় মধুমতীর তীরে স্বামীর অপেক্ষাতে। এদিকে এক এক করে জেলে পাড়ার জেলেরা মাছ ধরে ঘরে ফিরতে শুরু করে। কিন্তু তার স্বামী গদাধরের ফিরে আসার নাম নেই। এভাবেই দিন কাটতে লাগলো। দিন গড়িয়ে সপ্তাহ হলো। সপ্তাহ গড়াল গিয়ে মাসে। শেষ হয়ে গেল পুরো বর্ষা। একসময় জেলে পাড়ার সব জেলেরা নিজ নিজ ঘরে ফিরে এলো, কিন্তু গদাধরের ফিরে আর ফিরে আসে না। একদিন গদাধরের সাথে নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া জেলেরা ফিরে এসে গদাধরের স্ত্রীকে জানায় যে, নদীতে মাছ শিকার করতে গিয়ে হঠাৎ ওঠা ঝড়ের কবলে পড়ে গদাধরের নৌকাটি ডুবে যায়। গদাধরকে আর ঝড় শেষে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও গদাধরকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তখন সবাই ধরে নিয়েছে ঝড়ে নৌকাডুবিতে অকালে প্রাণ খুইয়েছে গদাধর।

এই সময়ের মধ্যে গদাধরের স্ত্রী একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছে। অসময়ে বৈধব্যের স্বাদ পাওয়া গদাধরের স্ত্রী তার সদ্যজাত সন্তানের নাম

রাখে নদের চাঁদ। স্বামীকে হারিয়ে এবার সন্তান নদের চাঁদকে নিয়ে নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে সে। চাঁদ হয়ে উঠলো তার দুঃখিনী মায়ের একমাত্র অবলম্বন। চাঁদকে ঘিরেই তার মায়ের যত স্বপ্ন। এক মুহূর্তের জন্য নিজের সন্তানকে কাছ ছাড়া করতে না চাঁদের মা, পাছে স্বামীর মতো তার সন্তানও কখনো হারিয়ে যায়।

দিন কাটতে থাকে প্রকৃতির আপন নিয়মে। আর মায়ের পরমস্নেহে বেড়ে উঠতে থাকে নদের চাঁদ। একসময় সে পদার্পন করে যৌবনে। বাবার মতো নদীতে মাছ শিকার করতে যেতে চায় পাড়ার অন্য জেলেদের সাথে মিলে। কিন্তু তার মা চায় না যে সেও তার পিতার মতো নদীতে মাছ ধরতে যাক। বরং সে চায়, তার ছেলে বিয়ে করে সংসারি হোক, জমিতে খেতি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করুক। মায়ের হাজার বারণ সত্ত্বেও নদে চলে যায় নদীতে। নৌকা নিয়ে ঘুরতে তার ভালো লাগে। এদিকে মা তার ছেলেকে ঘরে আটকাতে ফন্দি আঁটে। ঠিক করে জেলে পাড়ার অনিন্দ্য সুন্দরী সরলার সাথেই ছেলের বিয়ে দেবে। ঘরে সুন্দরী বউ থাকলে চাঁদ আর কখনো বাইরে যেতে চাইবে না।

যেই ভাবা সেই কাজ। সরলার বয়স তখন তেরো। তার বাবা-মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলে তারাও রাজী হয়ে যায়। হাজার হোক নদের চাঁদ পাত্র হিসাবে মোটেও খারাপ নয়। জেলে পাড়াতে তার মতো ছেলে দ্বিতীয়টি নেই। যেমনি নায়কোচিত দর্শন, তেমন কোমল স্বভাব। কারো সাতেপাঁচে একেবারেই থাকে না।

অন্যদিকে মায়ের কথামতো ঘরে মন বসাতে পারে না নদের চাঁদের। সংসারী হতে চায় সে। বরং অন্য কিছু চায়। কিন্তু ঠিক কী চায় তা এখনো নিশ্চিত করে জানে না। শুধু এটুকু আঁচ করতে পারে, একবার সংসার জীবনে ঢুকে পড়লে তার সেই চাওয়া কখনো পূরণ হবে না। সে যা চায় তা পেতে হলে তাকে ঘর ছাড়তে হবে। তাই এক রাতে কাউকে কিছু না বলে গৃহত্যাগী হয় নদের চাঁদ–পা বাড়ায় অজানার পথে।

নদের চাঁদ নিরুদ্দেশ হওয়ার পর তার মায়ের দুঃখের আর সীমা থাকে না। সন্তান হারিয়ে রাতদিন শুধু অশ্রুপাত করে কাটাতে শুরু করে সে। স্বামীকে হারানোর শোক কিছুটা হলেও কমিয়ে দিয়েছিল এই সন্তান। কিন্তু সেই সন্তানকে হারানোর শোক কীভাবে কমতে পারে?! কথিত আছে, রাতদিন অনবরত অশ্রু বিসর্জন করতে থাকায় একটা সময়ে গিয়ে নদের চাঁদের মা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যদিও অনেকে আবার চাঁদের মায়ের অন্ধত্বের বিষয়টি স্বীকার করে না। তবে একমাত্র সন্তানকে হারানোর যন্ত্রণা বিশদে

বর্ণনার প্রয়োজন নেই।

যাই হোক, সময় আর নদীর স্রোত কারোর জন্য অপেক্ষা করে না। বয়ে চলে নিজস্ব গতিতে। সেভাবেই চলতে লাগলো সব। কিন্তু চাঁদের কোনো খবর নেই। এভাবে কেটে গেল দশটি বছর। একটা সময় সবাই ধরে নিলো গদাধরের মতো তার ছেলে নদের চাঁদও আর কখনো ফিরে আসবে না। কিন্তু সবার ধারণাকে মিথ্যা করে দিয়ে একদিন ঠিকই কোথা থেকে যেন আবির্ভূত হলো সে। এদিকে মায়ের অন্ধত্বের জন্য অনুতপ্ত চাঁদ মাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। অন্যদিকে এত বছর পর নিজের সন্তানকে ফিরে পেয়ে বৃদ্ধা মায়ের আনন্দ আর ধরে না। গত দশ বছর সে কোথায় ছিল, কার সাথে ছিল, কী করেছে–সে সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার কথা একেবারেই ভুলে গেল।

যা হোক, একবার যখন ছেলে ফিরে এসেছে, তখন আর তাকে হারাতে চায় না মা। তড়িঘড়ি করে ছেলের বিয়ে দিয়ে দেয় সরলা নাম্মী সেই মেয়েটির সাথে, যার সাথে দশ বছর আগে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। স্ত্রীর সারল্য আর মিষ্টি মুখখানার প্রেমে পড়ে সংসারের মায়ায় আটকে যায় নদের চাঁদ। লোকের খেতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে শুরু করে সে। যা আয় করে তাতে মা-বউকে নিয়ে বেশ সুখেই দিন কাটছিল তার। ভোরবেলা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সারাদিন খেতে কাজ করে। বাড়ি থেকে গামছায় করে নিয়ে যাওয়া গুঁড়-মুড়ি দিয়েই দুপুরের খাওয়া সারে। সন্ধ্যায় ফিরে আসে বাড়িতে। এরপর রাতে খাবার খেয়ে বউয়ের সাথে গল্প করতে বসে। নদের চাঁদের দিনগুলো এভাবেই কাটতে থাকে।

কথায় কথায় সরলা একদিন তার স্বামীর কাছে জানতে চায় দশ বছর আগে তার স্বামী কেন তাকে বিয়ে না করেই পালিয়ে গিয়েছিল? আর এই দশ বছর সে কোথায় ছিল? কিন্তু নদের চাঁদ সেকথা এড়িয়ে যায়। তার স্ত্রীও নাছোড়বান্দা। চেপে ধরে জানার জন্য। কিন্তু কোনোভাবেই সেসব দিনের কথা বলতে চায় না চাঁদ। এদিকে স্ত্রীও গাল ফুলিয়ে বসে থাকে। অগত্যা বাধ্য হয়েই মুখ খোলে চাঁদ। স্ত্রীকে শোনায় এক অদ্ভুত দেশের গল্প। সেই দেশের নাম কামাখ্যা। গত দশ বছর সে নাকি সেখানেই কাটিয়ে এসেছে। সেখানকার মানুষেরা জাদু জানে। চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। শুধু তাই নয় মানুষকে তারা বাঘ, শিয়াল, গাধা, ভেড়া বানিয়ে ফেলতে পারে এক পলকেই। নিজেরাও ধারণ করতে পারে বিভিন্ন জন্তুজানোয়ারের রূপ। এটুকুতেই শেষ নয়, ওরা নাকি মরা মানুষকে জীবিত করতে পারে বলে জানায় চাঁদ। বড়োই অদ্ভুত সেই দেশ। সেই সাথে অদ্ভুত সেই দেশের

গল্পগুলো। সরলা গ্রামের মেয়ে। সেসব গল্প শুনে কখনো কখনো চমকে উঠে। স্ত্রীকে সব কথা বললেও কাউকে এসব কথা না বলার ব্যাপারে চাঁদ ঠিকই তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয়। সরলাও তার স্বামী প্রতিশ্রুতি দেয় যে, এসব কথা সে কখনোই কাউকে বলবে না।

সেদিনের পর থেকে চাঁদ তার স্ত্রীকে কামাখ্যার বিভিন্ন গল্প শোনায়। কথায় কথায় একদিন স্ত্রীকে সে ভীষণ অদ্ভুত একটি গল্প শোনায়। মানুষকে কুমির বানানোর গল্প। কামাখ্যায় নাকি মানুষ মন্ত্রবলে কুমিরের রূপ ধারণ করতে পারে। একথা শুনে অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে তার স্ত্রী। কুমিরের কথা সরলা এর আগেও বহুবার শুনেছে। মায়েরা তাদের ছোটো ছোটো সন্তানদেরকে নদীতে যাওয়া থেকে আটকাতে কুমিরে ভয় দেখায়। তাছাড়া বড়ো হয়েও অনেকের কাছে নদীতে কুমির থাকা গল্প সে শুনেছে। কুমিরগুলো নাকি মানুষ খায়। তাই সে নদের বিশ্বাস করতে চায় না। এও আবার হয় নাকি কখনো, মানুষ হবে কুমির, তাও যে কুমির মানুষ খায়। যদিও একথা সত্য যে নদের বলা কোনো গল্পই সে সহজে বিশ্বাস করতে চায় না।

একসময় সে তার স্ত্রীকে জানায় যে, কামাখ্যায় থাকাকালে সে এক মহিলার কাছে কুমির হওয়া বিদ্যা শিখেছে। নিজের গুরুর গল্পও স্ত্রীকে শোনায়। সে কোথায় থাকে, নাম, তার ক্ষমতা সবকিছু বিস্তারিতভাবে সরলার কাছে খুলে বলে। আর এও জানায় যে, সে নিজেও কুমির হতে পারে। একথা শোনার পর সরলা তার স্বামীর কাছে বায়না ধরে–কুমির হতে বলে চাঁদকে। কিন্তু তার কথায় রাজী হয় না চাঁদ। আবারও অভিমান করে স্ত্রী। চাঁদের সাথে কথা বলাও বন্ধ করে দেয় সে। এদিকে চাঁদের এসব ভালো লাগে না। নিরুপায় চাঁদ স্ত্রীর কথা ফেলতে পারে না শেষ পর্যন্ত। রাজী হয় তার প্রস্তাবে। জানায় রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে কুমির হয়ে দেখাবে সরলাকে।

মধ্যরাত। এক পাত্র জল নিয়ে ঘরের ভেতর হাজির হয় নদের চাঁদ। মন্ত্র পড়ে পাত্রটিতে ফুঁ দেয় সে। এরপর স্ত্রীকে জানায় মন্ত্র পড়ে সে কুমিরে পরিণত হবে। এরপর কুমিরের গায়ে মন্ত্রপূত জল ছেটালেই পুনরায় আবার মানুষ হয়ে উঠবে। যা হোক, খাটে উঠে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো চাঁদ। সরলা দাঁড়িয়ে আছে খাটের পাশেই। উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে কখন তার স্বামী কুমিরে পরিণত হবে সেটি দেখার জন্য। তার মাথার মধ্যে নানা রকম ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে–চাঁদ কখন কুমির হবে, কীভাবে কুমির হবে। সরলা যখন এসব ভাবছে, ঠিক তখনই কাঁথার নিচে থেকে বেরিয়ে এলো চাঁদের

দেহের একটা অংশ। না, মানবদেহের অংশ নয়। কারণ মানবদেহে চ্যাপ্টা গোছের, কাঁটাযুক্ত কোনো অংশ নেই। তারপর পরই কাঁথার নিচ থেকে বেরিয়ে এলো কুমিররূপী নদের চাঁদ। চাঁদের এই ভয়ঙ্কর দর্শন দেখে ভয়ে আঁতকে উঠলো তার স্ত্রী সরলা। ঘরের ভেতর, খাটের ওপর একটা জ্যান্ত কুমিরকে লেজ নাড়তে দেখে আঁতকে ওঠাটাই স্বাভাবিক। ভয়ে চিৎকার করে উঠে অজ্ঞান হয়ে যায় সে। আর তখনই তার হাত থেকে জলপাত্রটি মেঝের ওপর পড়ে যায়।

আবার এমনও শোনা যায়, কুমিররূপী নদের চাঁদকে দেখে তার স্ত্রী ভয়ে চিৎকার করে উঠে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। আর তখনই অসাবধানতাবশত মন্ত্রপূত জল রাখা পাত্রটি পড়ে যায় মেঝের ওপর। অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে চাঁদ তার স্ত্রীকে পালিয়ে যেতে দেখে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয় সরলা। আর তখনই সম্বিৎ ফিরে পায় চাঁদ। ততক্ষণে শুকনো মাটির মেঝে সব জল শুষে নিয়েছে। তবু নদের চাঁদ ভেজা মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকলো নিজের মানুষরূপ ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশায়।

এদিকে ঘরের দুয়ারে বসে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলো সরলা। পুত্রবধূকে চিৎকার করে কেঁদে উঠতে শুনে এগিয়ে আসে নদের চাঁদের মা। অন্ধ বৃদ্ধা কান্নার শব্দ অনুসরণ করে নিজের ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। সরলাকে ঘরের দরজার সামনে বসে ক্রন্দনরত অবস্থায় আবিষ্কার করে সে। অন্ধ হলেও এটা যে সরলা সেটি চিনতে ভুল হয় না তার। পুত্রবধূর কণ্ঠস্বর ভালোভাবেই চেনে সে। চাঁদের মা ধারণা করে যে, চাঁদ হয়তো তার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছে। তাই তাকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে যায়। এদিকে শাশুড়িকে পাওয়া মাত্র জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে সরলা। মুখে কিছু বলতে পারে না সে। কী ঘটেছে সে কথা মুখে বললেও বিশ্বাস করানো যে বড্ড শক্ত। একসময় কিছুটা ধাতস্থ হলে শাশুড়িকে সে সবটা খুলে বলে। দশ বছর আগে চাঁদের নিরুদ্দেশ হওয়ার গল্প থেকে শুরু করে ঐ দশ বছর কোথায় ছিল, কার সাথে কাটিয়েছে, কী করেছে সবকিছু তাকে খুলে বলে সে। সবটা শোনার পর চাঁদের মা সিদ্ধান্ত নেয় যে করে হোক কামাখ্যা থেকে সে চাঁদ সেই মহিলা গুরুমাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে, যার কাছ থেকে জাদু শিক্ষা করেছে। আর কেউ কিছু করতে না পারুক সেই গুরু নিশ্চয় কিছু না কিছু ঠিকই করতে পারবে বলে চাঁদের মা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করে।

চাঁদের বৃদ্ধ মা তার পুত্রবধূকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কামাখ্যার

উদ্দেশ্যে। এদিকে ঘরের ভেতর বন্দী অবস্থায় পড়ে রয় চাঁদ। ওভাবেই কেটে যায় এক এক করে তিন তিনটি দিন। একসময় ক্ষুধার যন্ত্রণায় অতিষ্ট হয়ে উঠলো কুমিররূপী চাঁদ। তার পক্ষে আর না খেয়ে থাকা সম্ভবপর হলো না। ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে বাধ্য হয়ে ঘরের নড়েবড়ে দরজা ভেঙে বাইরে বেরিয়ে এলো চাঁদ। তখনই ঘটে বিপত্তি। এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। একসময় পুরো ঘটনা জানাজানি হয়ে যায়। সবাই তেড়ে আসে কুমিররূপী চাঁদের দিকে। আর কোনো উপায় না দেখে চাঁদ নেমে যায় মধুমতী নদীতে। বসবাস করতে শুরু করে সেখানেই।

এদিকে এক মাস তেরো দিন পর কামাখ্যা থেকে ফিরে আসে নদের চাঁদের মা আর বউ। সাথে করে নিয়ে আসে চাঁদের সেই গুরুমাকে, যার কাছ থেকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করেছিল চাঁদ। যদি কেউ কেউ বলে থাকে, মা-বউ নয়, বরং লোক মারফত কামাখ্যা থেকে নদের চাঁদের সেই মহিলা গুরুকে, যার কাছ থেকে সে যাদু বিদ্যার দিক্ষা নিয়েছিল, খবর দিয়ে নিয়ে আসা হয়। সাধিকাকে চাঁদকে পুনরায় মানুষ করার উদ্দেশ্যে তারা ছুটে যায় মধুমতীর তীরের সেই ঘাটটিতে, যেদিক দিয়ে চাঁদ নদীতে নেমে গিয়েছিল।

চাঁদের গুরুমা যখন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে নদে নদে বলে ডাকল, কুমিররূপী চাঁদ তখন গুরুর ডাকে সাড়া দিয়ে ডাঙায় উঠে এলো। তার মুখে ছিল বেশ বড়োসড়ো একটা ইলিশ মাছ, যার অর্ধেকটা ইতোমধ্যে সে ভক্ষণ করে ফেলেছে। চাঁদের গুরুর বুঝতে বাকি রইলো না যে, কুমিররূপী চাঁদ এরই মধ্যে আহার করা শুরু করে দিয়েছে। তারপক্ষে এখন আর কিছুই করা সম্ভব নয়। চাঁদ আর কখনোই মানুষরূপে ফিরে আসতে পারবে না।

এরপর থেকে নদের চাঁদের স্ত্রী নদী পাড়ে বসে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকে। নিজের করা ভুল তাকে সবসময় কুড়ে কুড়ে খেতে থাকে। একসময় তার পক্ষে সবকিছু অসহনীয় হয়ে উঠলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। সেই আরো কথিত আছে সে, চাঁদের মা প্রতিদিন মধুমতী নদীর তীরে গিয়ে ছেলের নাম ধরে ডাকলেই নাকি ডাঙায় উঠে আসতো কুমিররূপী চাঁদ। মায়ের হাতে খাবার খেয়ে আবার সে ফিরে যেত মধুমতী নদীতে। এভাবেই চলতে থাকে দুঃখিনী মা ও কুমিররূপী নদের চাঁদের জীবন।

একসময় এই নদীতে স্টিমার চলতো। কথিত আছে, একবার একদল ইংরেজ নৌকাযোগে মধুমতী নদী দিয়ে যাওয়ার সময় চরে বিশাল আকারের একটি কুমির দেখতে পায়। কুমিরটিকে তারা গুলি করে মেরে ফেলে। পরে এ খবর জানাজানি হলে এলাকার লোকজন মৃত নদের চাঁদ কুমিরটিকে উদ্ধার

করে নিয়ে আসে এবং হিন্দু রীতি অনুযায়ী সৎকার করে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। আজও ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলার মানুষের মুখে মুখে এই কিংবদন্তীটি আজো শোনা যায়। শুধু বোয়ালমারীই নয়, গোটা ফরিদপুরেই এই গল্পটি শোনা যেত একসময়। এটি এতটাই বিস্তৃতি লাভ করেছিল একসময় যে এই গল্প কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে সিনেমা। শুধু তাই নয়, এই ঘটনার সাথে যুক্ত হয়েছে আরো অনেক গল্প। জড়িয়ে গেছে অনেক জায়গার নাম।

বোয়ালমারীতে আজও নদের চাঁদের নামে রয়েছে স্কুল, ডাকঘর, গ্রাম। যদিও এই কিংবদন্তীটি মাগুরা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলের কিংবদন্তী বলেও দাবী করা হয়ে থাকে কোথাও কোথাও।

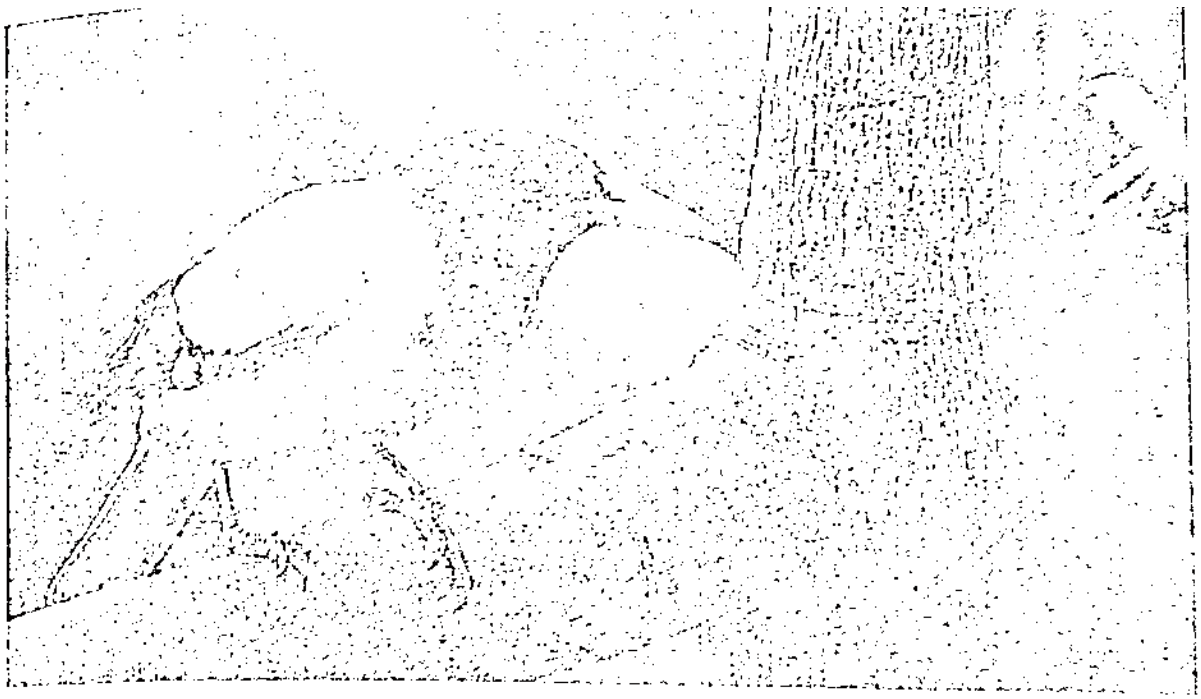

গায়ের লোক তাকে যত যা-ই বলুক না কেন, বাবার কাছে তার পরিচয়-পয়মন্ত ও লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে হিসাবে।

দিনের বেলায় বাড়িতেই থাকতো সবসময়। সারাদিন বাড়ির একাজ সেকাজ করেই কাটিয়ে দিতো। সূর্য পাটে বসলে যখন চারপাশে আলো কমে আসতো, যখন সবাই নিজ নিজ ঘরে ফিরতো, সেই সময়-অর্থাৎ, প্রতি সন্ধ্যায়-পানি আনতে নদীর ঘাটের দিকে যেত সে। তেমনি একদিন নদী থেকে পানি আনতেই ঘাটে গিয়েছিল। তিরতির করে বইছিল মৃদু ঠান্ডা হাওয়া। সেই হাওয়া প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছিল কঙ্কার শরীরে। সাথে করে নিয়ে আসা পানির খালি কলসিটিকে একপাশে রেখে জনমানবশূন্য নির্জন ঘাটটিতে আরাম করে বসে নিচুস্বরে গান ধরে মেয়েটি। তার গানের কণ্ঠও বেশ মিষ্টি। শুনলে কান জুড়িয়ে যায়। আরো শুনতে ইচ্ছে করে। আপন মনে গান গাইছিল সে, ঠিক তখনই একটি ভিনদেশী বজরা নিঃশব্দে নদীর আরেকটি ঘাটে এসে ভিড়ে। বজরার বাইরে থাকা যুবক সওদাগরের কানে যায় কঙ্কার সেই গান। গানের গলা শুনেই কঙ্কাকে মনে ধরে তার। বজরা থেকে নেমে গানের উৎস অনুসরণ করে সেদিকে এগিয়ে যেতেই স্বল্প আলোয় দেখে ঘাটে এক অনিন্দ্য সুন্দরী মেয়ে বসে আছে। সে-ই গাইছে এ গান। বেশভূষা দেখে অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে বলেই মনে হলো সওদাগরের কাছে। কিন্তু তাতে কী-বা এসে যায়। "কে তুমি এই সন্ধ্যায় নদীর ঘাটে নির্জনে বসে গান গাইছো," বলে ওঠে যুবক সওদাগর।

আকস্মিক কারো উপস্থিতিতে চমকে ওঠে কঙ্কা। তার বুকের ভেতর কিছু একটা যে ধড়ফড় ধড়ফড় করতে শুরু করেছে কঙ্কা তা অনুভব করতে পারছে। ভয় পেলেই এমন হয় তার। চট করে উঠে দাঁড়ায় কঙ্কা। পাশে রাখা কলসিটা হাতে তুলে নিয়েই তড়িঘড়ি করে বাড়ির দিকে ছোটে।

এদিকে কঙ্কা চলের যাওয়ার সময় স্বল্প আলোয় তার মুখখানা দেখে প্রেমে পড়ে যায় দূরদেশ থেকে আসা ভিনদেশী যুবকটি। সবসময় কঙ্কার চাঁদমুখটি তার সামনে ভাসতে থাকে।

বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসা বজরাটি সেই ঘাটেই ভেড়ানো থাকে আরো দিন কতক। আর এই সময়ে সওদাগরের সাথে বেশ কয়েকবার ঘাটেই দেখা হয় কঙ্কার। একটা সময় তার প্রতি সওদাগরের আগ্রহের বিষয়টি অনুধাবন করে সে। এদিকে যুবককেও তার খানিকটা মনে ধরতে শুরু করেছে। করবেই বা না কেন? অমন রাজোচিত চেহারা, সুদর্শন যুবক সে খুব কমই দেখেছে। কম নয়, আসলে কখনো দেখেইনি। একসময় সওদাগরের সাথে মনের বিনিময় হয় কঙ্কার। এভাবে কেটে যায় আরো কয়েক মাস।

এদিকে ঘনিয়ে আসতে থাকে বাণিজ্য শেষে সওদাগরের আপন দেশে ফেরার দিনটি। কিন্তু কঙ্কাকে ছেড়ে সে দেশে ফিরে গিয়ে শান্তি পাবে না তা খুব ভালো করেই বুঝতে পারে। তাই সে কঙ্কাকে সাথে নিয়ে দেশে ফেরার মনঃস্থির করে। আর এজন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে কঙ্কার বাবার কাছে যায়। কিন্তু অপরিচিত এক ভিনদেশী যুবকের হাতে নিজের মেয়েকে প্রথমদিকে তুলে দিতে একেবারেই নারাজ কঙ্কার বাবা। অবশ্য প্রথমে সওদাগরের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানালেও, পরবর্তীতে সওদাগরের নাছোড়বান্দা স্বভাব এবং মেয়ের সুখের কথা ভেবে একপ্রকার বাধ্য হয়েই বিয়েতে রাজী হয়ে যায় কঙ্কার বাবা। বেশ ঘটা করেই সওদাগরের সাথে বিয়ে হয় কঙ্কার।

বিয়ের পর স্বামীর সাথে সম্পূর্ণ অচেনা এক দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সে। প্রথমদিকে ভয় করতে থাকতো। কিন্তু তার প্রতি স্বামীর ভালোবাসা সেই ভয় কাটিয়ে উঠতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। দেশে ফেরার সময় বজরায় কাটানো দিনগুলো কঙ্কার বেশ ভালোই যেতে থাকে। বজরাতে বসে স্বামী-স্ত্রী মিলে বিকালের সৌন্দর্য উপভোগকালে কঙ্কা নিজের সংসারকে কীভাবে সাজাবে সেই ছক আঁকতে থাকে নিবিষ্ট মনে।

স্বামীর দেশে পৌঁছার পর আরেক দফা অবাক হয় কঙ্কা। সে এক বিরাট কারবার। নদীর ঘাট থেকে বাদ্যযন্ত্রের শব্দ ভেসে আসছে। ঘাটে বজরা ভেড়ার আগেই ছোটো ডিঙি নৌকা করে নতুন বউ নিয়ে দেশে ফেরার খবর দিয়ে নিজের বাড়িতে লোক পাঠিয়েছিল তার স্বামী। আর এই অল্পক্ষণেই বিস্তর আয়োজন! শুধু তাই নয়, এই দেশে তার স্বামীর রয়েছে অনেক সম্মান। অনেক নাম। বনেদী বংশ।

কিন্তু গরীব ঘরের মেয়ে কঙ্কা। পুত্রবধূ হিসাবে তাই তার শাশুড়ি মন থেকে কোনোভাবেই তাকে মেনে নিতে পারে না। প্রথমদিকের দিনগুলো তার ভালোই কাটে। কিন্তু যত দিন যেতে থাকে তত সুখে ভাটা পড়তে শুরু করে। আস্তে আস্তে বাড়ির সবার সাথে খুব ভালো সখ্যতা গড়ে উঠলেও শাশুড়ির সাথে কখনোই তার বনিবনা হতো না তার। অবশ্য এজন্য কঙ্কা মোটেই দায়ী ছিল না। শাশুড়ির মন জোগাতে সে যত যা-ই করুক না কেন, শাশুড়ি তাতে ঠিকই দোষ খুঁজে বের করে নিয়ে ভৎর্সনা করে যেত তাকে। সবসময়ই এমনটা আচরণ করতো তার সাথে। ছোটোখাটো বিষয়ে শোনাতো নানান কটু কথা। শুধু তাকে কথা শুনিয়েই ক্ষান্ত দিতো তা নয়, তার বংশপরিচয়, এমনকি বাবাকে তুলে নানারকম গালমন্দ করতো বিভিন্ন সময়। কখনো কখনো গায়েও হাত তুলতো। যদিও এ নিয়ে কোনো প্রকার উচ্চবাচ্য

করতো না সে; এমনকি স্বামীকেও জানাতো না কিচ্ছুটি। সবকিছু সহ্য করে যেত নীরবে, পাছে কোনোদিন তার শাশুড়ি নিজের ভুল বুঝতে পারে এই প্রত্যাশায়।

কিন্তু সেই সুদিন কখনোই আসেনি। উলটো পরিস্থিতি আরো খারাপ দিকে মোড় নিলো, যখন কঙ্কাবতীর স্বামী বাণিজ্য করতে দূরদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। শুরু হলো নতুন মাত্রায় কঙ্কার ওপর অকথ্য নির্যাতন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে দিয়ে ঘরের যাবতীয় কাজ করাতো তার শাশুড়ি। শুধু তাই নয়, কাজ তো করাতোই সেই সাথে পান থেকে সামান্য চুন খসলেই শুনতে হতো অশ্রাব্য ভৎর্সনা। সারাদিনের হাড় ভাঙা খাটুনি শেষে সন্ধ্যায় কঙ্কাবতী বাড়ি কাছের নদীর ঘাটে গিয়ে নীবরে অশ্রু বিসর্জন করতো, আর সৃষ্টিকর্তার কাছে আকুল প্রার্থনা জানাতো যেন তার স্বামী অতি শীঘ্রই বাণিজ্য শেষে দেশে ফিরে আসে। কিন্তু তার প্রার্থনা সৃষ্টিকর্তা তখনই কবুল করে না। তার জন্য আরো অনেক পরীক্ষা অপেক্ষা করছে যে।

যাই হোক, এভাবে কেটে যায় লম্বা সময়। এক পর্যায়ে শাশুড়ি তাকে ঠিকমতো পেট ভরে ভাতও খেতে দিতো না। প্রতিদিন একটু একটু করে কমতে শুরু করে প্লেটের ভাতের পরিমাণ। সবশেষে দিনে মাত্র একবার সামান্য কয়টা পানি দেওয়া বাসিভাত আর একটা কাঁচামরিচ জুটতো তার কপালে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটিও উঠে গেল তার কপাল থেকে। কঙ্কাকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করতে দজ্জাল শাশুড়িটি ভাতের পরিবর্তে তার প্লেটে তুলে দিতো চুলোর ছাই। কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করে ওভাবেই পড়ে থাকে সে। যন্ত্রণার মাত্রা একসময় অসহনীয় পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলে নিকটবর্তী জঙ্গল থেকে বুনোফল সংগ্রহ করে খেতে শুরু করে ক্ষুধা নিবারণের জন্য। ফল খাওয়ার সময় মুখে কালি মেখে নিতো, পাছে কেউ তাকে চিনে না ফেলে আর এতে তার স্বামীর সম্মানহানি হয়, কেননা স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর অসম্মান ঘোরতর পাপ।

এভাবেই জঙ্গলের গাছ থেকে বুনোফল সংগ্রহ করে তা খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতে থাকে কঙ্কা। ওদিকে তার স্বামীরও ফিরে আসার নাম নেই। ফল খেয়ে আরো কিছু দিন কেটে গেল, কিন্তু সেই ফলও ফুরিয়ে গেল একদিন।

বরাবরের মতো একদিন যখন মুখে কালি মেখে ফল খাওয়ার জন্য জঙ্গলে গেল, দেখল তার হাতের নাগালে আর কোনো ফলই অবশিষ্ট নেই। কঙ্কার কষ্টের সীমা রইলো না। হাতের নাগালের বাইরে থাকা ফলগুলোর দিকে তাকিয়ে সওদাগরের বউটি। এবার সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা জানায়

তাকে যেন তিনি পাখি বানিয়ে দেয়। কেঁদে কেঁদে স্রষ্টার কাছে বার বার এই প্রার্থনা জানাতে থাকে কঙ্কা। অতিরিক্ত ক্রন্দনের কারণে এক পর্যায়ে তার চোখ দুটো রক্তবর্ণ ধারণ করে।

এদিকে কঙ্কার কষ্ট স্রষ্টারও আর সহ্য হলো না। তাই এবার আর তাকে নিরাশ করলেন না তিনি–প্রার্থনা মতো কঙ্কাকে তিনি পাখি করে দিলেন। পাখি হয়ে সে এবার নাগালের বাইরে থাকা ফলগুলো খেতে সক্ষম হলো ঠিকই, কিন্তু আর কখনো মানুষরূপ ফিরে পেল না। পাখি হওয়ার সাথে সাথে মানুষের মতো কথা বলতে পারার ক্ষমতাটিও হারিয়ে গেল, যে কারণে পাখি থেকে মানুষ হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাতে পারলো না।

পাখি হলেও কঙ্কার গানের গলাটি ঠিকই আগের মতো রয়ে গিয়েছিল। তাই তো আজও গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়, আর সুরেলা কণ্ঠে গান গেয়ে যায় সারাদিন। ক্ষুধা পেলে গাছের ফল খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে। কথিত আছে, কঙ্কা মুখে কালি মেখে জঙ্গলে বুনোফল খেতে যেত, তাই পাখিটির মাথার পালকের রং কালো। সৃষ্টিকর্তা যখন তাকে পাখি করে দিলেন, তার পরনে তখন ছিল হলুদ রঙের শাড়ি। এ কারণেই সমস্ত শরীর হলুদ রঙের পালক দ্বারা আবৃত। মুখে কালি মাখতো বলে তার হাতেও কালি লেগে থাকতো, যে কারণে পাখিটির ডানার বেশকিছু পালক কালো বর্ণের। পাখিতে রূপান্তরিত হওয়ার আগে অতিরিক্ত ক্রন্দনের কারণে তার চোখ দুটো রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল বলেই সুন্দর এই পাখিটির চোখ দুটো রক্তবর্ণ। আর তার স্বামী একজন বেনে মানে ব্যবসায়ী ছিল বলে পাখি হয়ে যাওয়ার পর বেনে বউ নামে পরিচিতি লাভ করে সাধারণ মানুষের কাছে।

কোথাও কোথাও শাশুড়ি নয়, স্বয়ং স্বামীই তার ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাতো বলে জনশ্রুতি রয়েছে। আর তার কণ্ঠের গান নাকি আনন্দের নয়, বরং দুঃখের। বেনে বউ নাম ছাড়াও ইষ্টিকুটুম, কুটুমপাখি, বউ কথা কও, হলদে পাখিসহ আরো বেশ কয়েকটি নামে পল্লীবাংলায় পরিচিত এই পাখিটি। গ্রামের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, এই পাখিটি ডাকলে বাড়িতে কুটুম বা অতিথি আসে। তবে পাখিটির ডাকার সাথে বাড়িতে অতিথি আসার এমন জনশ্রুতির প্রচলন কী করেই বা হলো সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করে তেমন কিছুই জানা যায় না। হয়তো বা কঙ্কাবতী নামের গ্রামবাংলার সেই পয়মন্ত ও লক্ষ্মীমন্ত মেয়েটি অতিথিপরায়ণ ছিল, যে কারণে এমন জনশ্রুতি।

দিয়ে নিজ হাতে নিজের মাকে হত্যা করেছিল। মাথার ওপর মাতৃহত্যার দায় থাকায় তাকে অভিশপ্ত বলে মনে করা হয়। ব্রাহ্মণটির প্রকৃত নাম ছিল রাম, যে কিনা পরবর্তীকালে ইতিহাসে রাজা পরশুরাম নামে পরিচিতি লাভ করেছিল বলে কথিত আছে। এই পরশুরামই দুই ভাইয়ের মধ্যকার বিরোধের অবসান ঘটান। কিন্তু রাজার সাথে তার কীভাবে সখ্যতা গড়ে উঠেছিল সেই বিষয়ে পরিষ্কারভাবে কিছুই জানা যায় না। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, পরবর্তীকালে কোনো এক অজ্ঞাত উপায়ে গড়ের রাজা হিসাবে নিজেই গড়ের সিংহাসনে বসেন।

রাজা পরশুরামের রাজত্বকালেই মহাস্থানগড়ে আগমন ঘটে ইসলাম ধর্মপ্রচারক–দরবেশ শাহ সুলতান বলখির, এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। আজও তিনি এখানকার স্থানীয় মুসলিম অধিবাসীদের কাছে একজন পূজনীয় ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছেন। শুধু এখানকার মুসলিম অধিবাসীদের কাছেই নয়, বরং বলখি বাংলাদেশের অনেক মুসলমানের কাছে একজন ধর্মপ্রচারক হিসাবে সম্মানিত। তিনি শাহ সুলতান বলখি মহীসাওয়ার নামেও ইতিহাসে খ্যাত। বলা হয়, শাহ সুলতান বলখি ছিলেন মধ্য এশিয়ার বলখের শাসক। বলখের অধিবাসী হওয়ায় তার নামের সাথে 'বলখি' যুক্ত হয়েছে বলে মনে করা হয়ে থাকে। সম্রাট শাহ আলী আসগর ছিলেন তার পিতা। পিতার মৃত্যুর পর কিছুকাল বলখের শাসকরূপে সিংহাসনে আসীন ছিলেন, কিন্তু একসময় রাজ্য ও ঐশ্বর্য ত্যাগ করে ধর্মপ্রচারক হিসাবে আত্মপ্রকাশ। আনুমানিক ৪৪ হিজরি সাল মোতাবেক শাহ সুলতান বলখি মহীসাওয়ার বাংলাতে আসেন বলে ধারণা করা হয়। বলা হয়, প্রথম তিনি সন্দ্বীপে পৌঁছান এবং এরপর সেখান থেকে আসেন পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রনগরে, যা বর্তমান মহাস্থানগড় নামে পরিচিত।

ধর্মপ্রচারক, দরবেশ শাহ সুলতান বলখিকে নিয়ে এক আশ্চর্য কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে এখানকার স্থানীয় মানুষের মুখে মুখে। অবশ্য এখন আর এই কিংবদন্তীটি কেবলমাত্র এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। কথিত আছে, তিনি যখন পুণ্ড্রনগর বা বর্তমান মহাস্থানগড়ে প্রবেশ করেছিলেন, তখন নাকি একটি বিশালাকার মাছের পিঠে চড়ে নিজের অনুসারীদের নিয়ে করতোয়া নদী পার হয়েছিলেন। মাছের পিঠে চড়ে নদীর পার হয়ে নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন বলেই তাকে মহীসাওয়ার নামে ডাকা হয়। উল্লেখ্য, *মহীসাওয়ার* শব্দটির অর্থ হলো 'মাছে পিঠে চড়ে আগমনকারী'।

মহাস্থানগড় পৌঁছেই তিনি এখানকার অধিবাসীদের কাছে ইসলামের

দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার কাজটি শুরু করলেন। এদিকে তাঁর বিভিন্ন কেরামতির কথা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে চারপাশে। ধীরে ধীরে রাজা পরশুরামের সেনাপতি, মন্ত্রী এবং কিছু সাধারণ মানুষ ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয়গ্রহণ করে। ক্রমে এই সংখ্যাটা বাড়তে থাকে। এতে করে এক পর্যায়ে রাজা পরশুরামের সাথে বিরোধ বাঁধে শাহ সুলতানের। সেই বিরোধ গিয়ে ঠেকে যুদ্ধে।

এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করেও রয়েছে বেশকিছু জনশ্রুতি। শোনা যায়, যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে রাজা পরশুরামের সৈন্যদের সাথে শাহ সুলতানের সৈন্যরা খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারছিলেন না। যুদ্ধে প্রতিদিন সুলতানের সৈন্যসংখ্যা একটু একটু করে কমতে থাকে। অন্যদিকে, রাজা পরশুরামের সৈন্যসংখ্যা পূর্বের মতোই থাকে; কমার কোনো চিহ্নই দেখা যায় না। বিষয়টি বিস্মিত করে সুলতানকে। রহস্য অনুসন্ধানে নামেন তিনি। আর তখনই তার কানে আসে এক অদ্ভুত খবর। জানতে পারেন রাজা পরশুরামের কাছে রয়েছে এমন একটি বিস্ময়কর কূপ, যে কূপের পানিতে রয়েছে আশ্চর্যরকমের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা। সেই ক্ষমতাটি মোটেও যেন তেন কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নয়, বরং মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে পারার এবং আহত ব্যক্তিকে পুরোপুরি সারিয়ে তুলতে পারার ক্ষমতা। বলা হয়ে থাকে, মৃত বা আহত ব্যক্তির ওপর কূপের পানি ছিটিয়ে দিলেই নাকি আবার প্রাণ ফিরে পায় বা সম্পূর্ণ সুস্থ্য হয়ে ওঠে সেই ব্যক্তিটি। যুদ্ধে রাজার যেসব সৈন্য নিহত হতো, রাতের অন্ধকারে এই কূপের পানি ব্যবহার করে তিনি তাদেরকে পুনরায় জীবিত করতেন। এই কূপের পানি পান করার মধ্য দিয়ে আহত সৈন্যরা সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে যেত এবং পরের দিন রাজা তাদেরকে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করতেন।

এ খবর শোনার পর শাহ সুলতান বলখির কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ে। কী করে এই ঘোরতর বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবেন সেই ভাবনায় বিভোর হয়ে পড়েন। হবেনই বা না কেন, যদি এভাবেই চলতে থাকে তাহলে একটা সময় তার সব অনুসারীকে হারাতে হবে। সঙ্গে রাজার কাছে যুদ্ধে পরাজিত তো অবধারিত। কূপের পানির অলৌকিক ক্ষমতাটি নষ্ট করে দেওয়ার পরিকল্পনা আঁটতে শুরু করেন তিনি। একটা সময় পেয়েও যান একটি কার্যকরী উপায়। নিজের অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি চিল তৈরি করেন। চিলটির সাহায্যে কূপের মন্ত্রপূত পানিতে এক টুকরো গরুর মাংস ফেলেন, আর তাতেই অপবিত্র হয়ে যায় কূপের পানি। নষ্ট হয়ে যায় সেটির অলৌকিক ক্ষমতাটি। অলৌকিক সেই কূপটি জিয়নকুণ্ড নামে পরিচিত

ছিল, যার অস্তিত্ব এখনো বিদ্যমান। অবশ্য তাতে এখন আর পানি নেই। স্থানীয়দের কাছে কূপটিকে অমরকুণ্ড নামেও পরিচিত।

যাই হোক, বলা হয়ে থাকে, কূপটি তার অলৌকিক ক্ষমতা হারানোর পর স্বয়ং রাজা পরশুরাম ঘোর বিপদের মধ্যে নিমজ্জিত হোন। সুলতানের সুদক্ষ বাহিনীর কাছে এক এক করে রাজার সৈন্যরা মারা যেতে থাকে। এতে করে শক্তি ক্ষয় হতে শুরু করে রাজার। শেষ পর্যন্ত এ যুদ্ধে শাহ সুলতানই জয়ী হোন। রাজা পরশুরাম পরাজিত ও রণাঙ্গনেই নিহত হোন। সুলতানের সেনাদের হাতে বন্দী হোন তার বোন, মতান্তরে তার কন্যা–শিলাদেবী।

কথিত আছে, শত্রু সেনাদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার শঙ্কা থেকে শিলাদেবী একরাতে কারারক্ষীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং গড়ের পূর্বপাশে থাকা করতোয়া নদীর ঘাটটিতে গিয়ে আত্মহত্যা করেন। সেই থেকে এই ঘাটটি শিলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত।

প্রতি বছর স্থানীয় হিন্দুরা এ ঘাটে স্নান করে। এখানে মেলাও বসে। যদিও শিলাদেবীর ঘাট নিয়ে এ অঞ্চলে আরো একটি জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। বলা হয়, এই ঘাটে একসময় বড়ো বড়ো নৌকা ভিড়তো। সেই নৌকাগুলোতে থাকতো প্রচুর পাথর বা শিলা। এই ঘাটেই সেই শিলাগুলো নামানো হতো বলে জায়গাটির নাম একসময় শিলাদ্বীপ ঘাট নামে পরিচিতি লাভ করে। এই শিলাদ্বীপ ঘাটটিই পরবর্তীতে শিলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিতি লাভ করে বলে কথিত আছে।

মহাস্থানগড় বাসস্ট্যান্ড থেকে কিছুটা পশ্চিমে টিলার মতো উঁচু স্থানে একটি মাজার শরীফ অবস্থিত। এই মাজার শরীফটিই মূলত শাহ সুলতান বলখি মহীসাওয়ারের মাজার বলে স্বীকৃত। স্থানীয়রা শাহ সুলতান বলখি মহীসাওয়ারকে খুবই শ্রদ্ধা করে। নানা সমস্যার সমাধান চেয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা এখনো তার মাজারে আসেন এবং মানত করেন।

শাহ সুলতানে মাছের পিঠে করে গড়ে প্রবেশ, জিয়নকুণ্ডের পানির মৃতকে জীবিত ও আহতকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করে তোলার অলৌকিক ক্ষমতা ও শিলাদেবীর আত্মহত্যা এসবের কোনোটিই ঐতিহাসিকভাবে সেভাবে স্বীকৃত নয়। এগুলো কেবল এখানকার স্থানীয় লোকেদের মুখে মুখে প্রচলিত কিংবদন্তী মাত্র।

নামের কিংবদন্তী
(অভ্যন্তরীণ ঢাকা)

বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের ওপরে
একটি শিশিরবিন্দু।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কবিতাটির পংক্তিগুলোর মতোই ঘর থেকে বের হয়ে আমরা যে দৃশ্য, যে পরিবেশ দেখতে পাই, তার সৌন্দর্য কখনোই সম্পূর্ণরূপে অবলোকন করতে পারি না। আমাদের পক্ষে হয়েও ওঠে না। তেমনিই এর শেকড়ে অনুসন্ধানেও মন সায় দেয় না ঠিকমতো। কখনো কি ভেবে দেখেছেন আপনি যে এলাকার বাসিন্দা, সেই এলাকাটির নাম এমন কেন? কখনো কি জানতে ইচ্ছা করেছে, এই নামের গোড়াপত্তন হলো কীভাবে? কিংবা এর পেছনে থাকা ইতিহাসই বা কী? উত্তরটা না-ই হওয়ার কথা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, কারণ বহু চর্চিত এই জায়গাগুলোর নাম আমরা কেবলমাত্র আমাদের মাথার ভেতর সংরক্ষণ করে রেখেছি।

ইতিহাসের শহর ঢাকার ঐতিহ্য প্রাচীন ও গৌরবময় হলেও একইসাথে এটি রহস্যমতায় আচ্ছন্ন। যুগে যুগে, কালে কালে নামের প্রচ্ছন্নতাকে নানা উপকাহিনী, কল্পকথা-কিংবদন্তী বা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আরো বেশি রহস্যময় করে তুলেছে রাজধানী ঢাকাকে। ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার নাম মুঘল আমলে প্রচলিত নামগুলো এখনো টিকে আছে। মুঘল আমলেই ঢাকার গুরুত্ব সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন : টুলি/টোলা (বসতি), বাগ(বাগান/বাগিচা)।

কবি হাসে, টাকা ভাসে গঙ্গাবুড়ির শহরে...

গঙ্গাবুড়ির শহরে শুধুমাত্র কবিই হাসেন না, টাকাও কেবল ভাসে না, এখানকার প্রতিটি রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য কিংবদন্তী। আসুন ঢাকার অভ্যন্তরীণের কিছু জায়গার নামের এমন কিছু কিংবদন্তীর গল্প শোনা যাক।

।। চার ফকিরের পুল ।।

মধ্যযুগে মুসলিম শাসক গোষ্ঠি বাংলায় বিস্তার লাভ করে। তাদের সাথে সাথে এদেশে হাজির হতে শুরু করে বহু ফকির-দরবেশ। ধর্ম প্রচারের স্বার্থে ছড়িয়ে পড়ে দেশের আনাচে-কানাচে। তেমনি ঢাকায় ধর্ম প্রচার করতে আসা চার ফকিরকে মৃত্যুর পর বহুকাল আগে এক স্থানে একসাথে কবর দেওয়া হয়। সেই কবরগুলোর ওপরে আচমকাই একরাতে দেখা যায় একটি কাঠের সাঁকো। সেই থেকে ঐ সাঁকোটি ফকিরের পুল নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীকালে ফকিরের পুল নাম অপভ্রংশ হয়ে ফকিরাপুল নামে খ্যাত হয়। ধীরে ধীরে জায়গাটি ঘিরে গড়ে ওঠে জনবসতি। বিংশ শতাব্দীতেও মানুষ কাঠের পুলের আশেপাশে চেরাগবাতি জ্বালাতো। আজ আর সেই পুল নেই, কিন্তু জায়গাটির নাম ঠিকই রয়ে গেছে "ফকিরাপুল"।

।। ঢাকার মধ্যে দুটি গ্রাম ।।

যদি বলি ঢাকার মধ্যে দুটি গ্রাম রয়েছে, তাহলে নিশ্চয় আপনার চোখ কপালে উঠবে। কিন্তু, এ কথা সত্য যে বড়ো বড়ো অট্টালিকায় ঘেরা ঢাকা শহরে দুটো গ্রাম সত্যিই রয়েছে : 'খিলগাঁও' আর 'তেজগাঁও'।

খিল মানে চাষের অযোগ্য উচুঁ জায়গা আর গাঁও মানে গ্রাম। অনেক বছর আগে খিলগাঁও ছিল উঁচু-নিচু টিলায় ভরা এলাকা। স্থানীয়ভাবে উঁচুনিচু বলে একে বলা হতো খিল অর্থাৎ যে জায়গা চাষের অযোগ্য। এককালে অল্পকিছু মানুষের বসবাস ছিল এই খিলগাঁওয়ে। এরপর যত দিন যেতে থাকলো জনবসতি বাড়তে থাকলো খিলগাঁওয়ের দিকে। ঢাকা মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত হলো এ এলাকা, কিন্তু নাম সেই খিলগাঁওই রয়ে গেল।

কোনো ব্যক্তি অত্যাধিক হম্বিতম্বি করলে লোকে তাকে একসময়

বলতো, 'বড় ত্যাজ দেখাইতেছ মিয়া'। কিংবা 'তেজী জোয়ান' বলারও প্রচলন রয়েছে। তেমনি ছিল মুঘল আমলে পর্তুগিজেরা। মেঘনার মোহনায় জলদস্যুতাই ছিল এই পর্তুগিজদের প্রধান পেশা। কাজটাও খুব দক্ষতার সাথে শেষ করতো তারা। খুব দ্রুততার সাথে আক্রমণ পরিচালনা করে, আবার দ্রুততার সাথেই পলায়নও করতো সেখান থেকে।

এহেন অবস্থায় পরবর্তীতে মুঘল শাসকেরা এদের শায়েস্তা করতে নড়েচড়ে বসলেন। এক পর্যায়ে নিজেদের পেশা বদলাতে বাধ্য হয় এরা। তখন এদের অনেককেই সম্রাটের বাহিনীতে ওলন্দাজ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। কথিত আছে, সেই সময় ঢাকায় এদের একটি বড়ো নিবাস গড়ে উঠে। আর এই তেজী পুরুষের থাকতো বলেই একসময় সেই জায়গাটি পরিচিতি পায় তেজগাঁও নামে।

।। নীলক্ষেতে নীল চাষ।।

বর্তমানে ঢাকায় থাকে এমন কারোর যদি বই কেনার প্রয়োজন হয় তবে সবার প্রথমেই যে নামটি মনে পড়ে সেটি হলো নীলক্ষেত। নামের সাথে যখন নীল শব্দটি যুক্ত রয়েছে, তখন নিশ্চয় এটা বুঝতে পারছেন যে এখানে নীলের জোরদার সম্পর্ক বিদ্যমান।

হ্যাঁ, ইংরেজ আমলে বেশ কিছু নীলকুঠি ছিল ঢাকার বুড়িগঙ্গার তীরে। তবে নীলের উর্বর ফলন হতো এই নীলক্ষেতে। একটু কল্পনা করুন তো, আজ যেখানে সারি সারি বইয়ের দোকান, ইউনিভার্সিটি, কলেজ, ছাত্রছাত্রীদের থাকবার জন্য ছাত্রাবাস রয়েছে, একসময় সেখানেই কেতাদুরস্ত পোশাক পরিহিত সাহেবরা ঘোড়া হাঁকিয়ে চলতো নিজেদের সাধের নীলের ক্ষেতগুলো দেখতে!

দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত নাটক 'নীলদর্পন' সর্বপ্রথম এই ঢাকাতেই মুদ্রিত ও অভিনীত হয়। তখনকার সময়ে আজকের এই নীলক্ষেত ছিল বাস্তবিকই নীল চাষের ক্ষেত। এখান থেকেই স্থানীয়দের কাছে এই জায়গাটির নাম 'নীলক্ষেত' নামে পরিচিতি লাভ করে।

আজ যদিও ইংরেজ আমলের সেই নীল ক্ষেত নেই, নীল চাষীরা নেই, নাক উঁচু সাহেব নেই, কিন্তু আজও রয়ে গেছে পুরোনো সেই নামটি।

।। জিন্দাবায়োর গলি ।।

ঐতিহাসিক ইসলামপুরের নিকটে রয়েছে 'জিন্দাবায়োর কি গালি' যার অপভ্রংশ রূপ 'জিন্দাবাহার'। এই নামের পেছনে রয়েছে মজার একটি কিংবদন্তী।

বহুকাল আগে হিন্দুস্থানের পশ্চিম থেকে এক মাস্তান আস্তানা গেঁড়েছিল এখানে। তার একটি প্রিয় কুকুর ছিল। কুকুরটিকে সে বায়োর নামে ডাকতো। মাস্তানটি সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরে যখন আস্তানায় ফিরতো, 'বায়োর বায়োর' করে ডাক দিতেই হাজির হয়ে যেত তার কুকুরটি। একদিন মাস্তানকে ঘিরে রয়েছে তোষামুদের দল, মাস্তান বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো, 'নাহ্ তোমাদের জ্বালায় আর পারছি না বাপু!' একথা বলার সাথে সাথে মাস্তান 'ইল্লাল্লাহ্' বলে উচ্চঃস্বরে একবার হাঁক দিতেই সবার সামনে থেকে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেল। তার কিছুক্ষণ পরেই কুকুরটি কোথা থেকে যেন আস্তানায় এসে হাজির হলো। এরপর সবার সামনে কুকুরটিও যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। এ ঘটনার পর আর কখনো সেই মাস্তান আর তার কুকুরটিকে দেখা যায়নি।

এই আশ্চর্য ঘটনায় মাস্তান জিন্দাপীরের উপাধি পেলো, আর গলিটি নাম পেল 'জিন্দাবায়োর কি গালি'। অন্য সূত্র মতে, মাস্তান তার সাগরেদদের হুকুম দেয় তাকে ও কুকুরটিকে জিন্দা কবর দিতে। এ থেকে এ গলির উক্ত নামকরণ করা হয় বলেও জনশ্রুতি রয়েছে।

।। বেঙ্গলাবাজার ।।

মুঘল আমলের আগের ঢাকার অতিপুরাতন ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে বাংলাবাজার, যেটি বর্তমানে অধিকাংশ প্রকাশনী ও পাইকারি বইয়ের বিক্রয় কেন্দ্র হিসেবে বাংলাবাজার সুপরিচিত।

রোমান নাবিক ভারটোনামাস ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে লিখে গেছেন বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট সিল্ক ও সুতা তৈরি হয় বেঙ্গলাতে। বহু বিদেশি পর্যটক একে 'বেঙ্গলা' বলেই উল্লেখ করেছেন। এই বেঙ্গলাবাজার ছিল সেই সময়ের ব্যবসাবাণিজ্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু। বলা হয়ে থাকে যে, তৎকালীন বেঙ্গলাবাজার নামের অপভ্রংশ রূপ হচ্ছে আজকের 'বাংলাবাজার'।

।। চাঁদ খাঁ'র পুল ।।

মুঘল আমলে বুড়িগঙ্গার ওপারের একটি অংশ পরিচিত ছিল 'বাঁকে চাঁদ খাঁ' নামে। মূলত চরটি দেখতে অনেকটা অর্ধেক চাঁদ, অর্থাৎ হাঁসুলির মতো বাঁকা ছিল। ঐ সময় বুড়িগঙ্গা নদী লালবাগ দুর্গের পাশ দিয়ে বয়ে যেত। তারই দক্ষিণে এ চরটির অবস্থান ছিল।

কথিত আছে, একসময় এ জায়গাটিকে সম্বোধন করা হতো 'চাঁদ খাঁ কা হাসলি'। সেকালে চাঁদ খাঁ ঢাকার একজন বিশিষ্ট ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। নিমতলীর নিকট 'চাঁদ খাঁর পুল' নামে এলাকাটি আজও পরিচিত। চাঁদ খাঁ পুলটি নির্মাণ করিয়েছিলেন বিধায় এর পাশের বস্তিটিও এ নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে এটিকে মানুষ 'চাঁনখার পুল' হিসেবেই চিনে।

।। মগবাজারের কিংবদন্তী ।।

ইংরেজ, গ্রিক ও ফরাসিদের নামে ঢাকায় যেমন রাস্তাঘাট আছে, তেমনি বিভিন্ন ভীনদেশী ব্যক্তি ও গোত্রের নামেও রাস্তা ও জায়গার নাম রয়েছে। তেমনই সুপরিচিত একটি জায়গা হলো 'মগবাজার'। মগ বলতে সাধারণত আমরা পানি পান করার পাত্র বুঝে থাকি। কিন্তু মগবাজারের মগ হচ্ছে একটি জাতি।

১৬২০ সালে মগেরা বাংলা আক্রমণ করে। তাদের একটি দল ঢাকায় প্রবেশ করে। তৎকালীন মুঘল সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ ফতেহ্ জং তাদের বিতাড়িত করেন এবং প্রায় ৪ হাজার নৌযান দখল করে নেন। ১৬৩৫-৩৯ সালে চট্টগ্রামের আরকান রাজের মগ গর্ভনর ম্যাংগত রায় পরিবার পরিজন নিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। আত্মসমর্পণের চুক্তি হিসেবে ঢাকায় একটি নির্দিষ্ট জায়গা দেয়া হয় তাদের বসবাসের জন্য। সেই জায়গাটির নাম হয় মগবাজার।

।। কামরাঙ্গী চরের নামকরণ ।।

ঢাকা মহানগরীর দক্ষিণ-পশ্চিমে বুড়িগঙ্গার মূল নদীর ওপারে রয়েছে কামরাঙ্গীর চর। এই কামরাঙ্গী চরের নাম নিয়ে আছে মজার কাহিনি। বহুকাল আগে এ চরের এক পরিবারের উদ্ভিন্নযৌবনা অনিন্দ্য সুন্দরী কামরাঙ্গী নামে এক মেয়ে ছিল বর্ষার ভরা গাঙে একদিন নৌকাডুবিতে কামরাঙ্গীর সলিল সমাধি ঘটে। এ ঘটনা শুনে তার প্রেমিক 'কামরাঙ্গী কামরাঙ্গী' বলে চিৎকার করতে করতে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। সেই সময় থেকে এ চরটি কামরাঙ্গীর চর হিসেবে পরিচিত। তবে অনেকে বলে, এ চরে কামরাঙ্গার মতো দেখতে মরিচ চাষ হতো, যা থেকে এটিকে কামরাঙ্গীর চর নামে ডাকা হয়।

।। সুবাদার ইসলাম খাঁ'র ইসলামপুর ।।

বাংলায় প্রথম মুঘল সুবেদার হিসেবে বাদামতলী ঘাটে পা রাখেন সুবেদার ইসলাম খাঁ। তিনি নদী ও তার আশেপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করে এর আশেপাশেই বসবাস করতে থাকেন। ধীরে ধীরে মুঘলদের কর্মস্থল ও বাসস্থান হিসাবে এটি গড়ে উঠে মোঘলটুলি নামে। এর পাশের এলাকাটিকেই সুবেদার ইসলাম খাঁ'র নামে ইসলামপুর নামকরণ করা হয়। ঢাকার ইতিহাসে ইসলামপুর সমৃদ্ধ ও অপরিহার্য একটি নাম। যদিও ইসলামপুরের নাম বদলে পরবর্তীতে নাম রাখা হয় বীরেন বোস স্ট্রিট, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি ইসলামপুর হিসেবেই পরিচিতি পায়।

।। ঝিগাটোলা ।।

একটি জায়গার নামের কত যে অপভ্রংশ হতে পারে তার দারুণ উদাহরণ মেলে রায়ের বাজারের কাছেই ঝিগাটোলায়। যা কিনা কোথাও লেখা মেলে 'জিগাতলা', 'ঝিগাতলা', 'ঝিগাটিলা'। কিন্তু সঠিক নামটি হলো ঝিগাটোলা। টোলা মানে হচ্ছে বসতি। একসময় এ এলাকায় প্রচুর ঝিগা গাছ দেখা যেত। লতায় পাতায় আচ্ছাদিত এই গাছটিকে অনেকে বাড়ির সীমানাপ্রাচীর হিসেবে ব্যবহার করতো।

।। গান্ধী গলি ।।

গান্ধী গলি নামটা শুনতেই ভারতের বিখ্যাত গান্ধী পরিবারের কথা সবার আগে মনে আসে। মহাত্মা গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী কার নামে এই গলির নাম?

প্রকৃতপক্ষে গান্ধী গলির সাথে এদের কারোরই কোনো প্রকার যোগসাজুস নেই। কথিত আছে, একসময় এখানে এক ব্যক্তির বসবাস ছিল যে কিনা ফুলের নির্যাস সংগ্রহ করে এক বিশেষ শোধনপদ্ধতির মাধ্যমে; চম্পা, বেলি, গোলাপ, বকুল, হাসনাহেনা, চামেলি ইত্যাদি নানা ফুলের নামে চমৎকার সুগন্ধি তৈরি করতেন। সেই সময় এই সস্তা দামের সুগন্ধি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং বাজারে সমাদৃতও হয়। এছাড়া তিনি গোলাপজল ও আতর তৈরিতেও দক্ষ ছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। যদিও তার তৈরি আতর ও গোলাপজল সেসময় গাজীপুরে তৈরি আতর ও গোলাপজলের সমকক্ষ ছিল না। যে ব্যক্তি এই সুগন্ধি তৈরি করতেন, গান্ধী হিসেবেই এলাকায় তিনি পরিচিত ছিলেন। আর এই গান্ধী সাহেব যে গলিতে থাকতেন একসময় তার নামে সেই গলির নাম হয়ে গেল 'গান্ধী গলি'।

।। শাঁখারী বাজার ।।

ঢাকার এই জায়গা এককালে উন্নতমানের শাঁখারী তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল। এখনো জায়গাটি তার পুরোনো ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। দাঁড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী হয়ে। কথিত আছে, শাঁখারীদের পূর্ববঙ্গে আগমন ঘটেছিল রাজা বল্লাল সেনের শাসনামলে। সেই সময় তাদের বসবাস ছিল বিক্রমপুরের দিকে। আর তারা বিক্রমপুরের যেখানে বসবাস করতো সেই জায়গার নাম ছিল শাঁখারী বাজার। কিন্তু মুঘলামলে সেই চিত্র পাল্টে যায়। জমির প্রলোভন দেখিয়ে বিক্রমপুরে বসবাসকারী এসব শাঁখারীদের তাদের স্থাপিত নতুন শহর ঢাকায় নিয়ে আসে। নতুন প্রতিষ্ঠিত শহরটি একটি জায়গা বেছে নিয়ে সেখানেই বসবাস শুরু করে তারা।

ঢাকার সেই জায়গাটি পরবর্তীতে শাঁখারী বাজার নামে পরিচিতি লাভ করে, যা আজও অক্ষয় রয়েছে।

পীর মাদারের পাঁচালি

ভক্তদের বিশ্বাস মতে পীর মাদার ছিলেন একজন মারেফতি পীর। কেউ যদি তাকে বাতেনি বলে মনে করে তাহলে সেটি হবে ঘোরতর পাপ কাজের একটি। মূল কথা হলো, এই পীরের বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই। তাঁর অস্তিত্ব কাল্পনিক। বাংলাদেশে যতজন লোকায়িত পীর-ফকির রয়েছেন, তাদের মধ্যে পীর মাদার হলেন অন্যতম। তার অনুসারী বা ভক্তদেরকে মাদারিয়া বলে সম্বোধন করা হয়। তবে অনেক গবেষক তাকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বলেও উল্লেখ করেন। কেউ কেউ পীর মাদারের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, তার প্রকৃত নাম ছিল বদিউদ্দিন শাহ মাদার।

পীর মাদরের বিভিন্ন কীর্তি নিয়ে আমাদের দেশে রচিত হয়েছে অনেক গান, যা তার ভক্তদের মুখে মুখে এখনো প্রচলিত রয়েছে। এই গানগুলো মাদার গান নামে পরিচিত। গানগুলোর মূল বিষয় হলো পীর মাদারের গুণকীর্তন করা। আমাদের লোকসংস্কৃতিতে মাদার গান এক অমূল্য স্থান দখল করে রয়েছে। পৌষসংক্রান্তি বা মাঘী পূর্ণিমায় সাধারণত মাদার বাঁশের জারি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। একসময় গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে, মাঠে-ময়দানে, উঠোনে-দাওয়ায় মাদারগানের আসর বসতো। পথে-প্রান্তরে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হতে থাকতো মাদার গানের সুর। পথ চলতে, লাঙল দিতে, জমি নিড়াতে, গরু চরাতে–সর্বত্রই মানুষের গলা থেকে বের হতো এই মাদার গানের ধূয়া। বিশেষ করে মহররমের চাঁদ উঠলে, কলেরা-বসন্ত দেখা দিলে, জমিতে মড়ক দেখা দিলেই মাদার গানের আসর বসতো।

পীর মাদারের জন্ম নিয়ে তার ভক্তদের মধ্যে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে। বলা হয়, হারুত-মারুত নামে দুজন ফেরেশতা একবার পৃথিবীর মানুষের জীবন পর্যবেক্ষণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। তারা আল্লাহ্‌র নিকট নিজেদের মনের ভেতরে থাকা আর্জিটি তুলে ধরে। অনুমতি প্রার্থনা করে পৃথিবীতে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আল্লাহ্ প্রথমে তাদের অনুমতি প্রদান করলেন না। তবুও হাল ছাড়ে না তারা। শেষমেশ অনুমতি মিললেও তাদেরকে শেষবারের মতো এই বলে সাবধান করে দেওয়া হয় যে–জগতের প্রতি

আসক্তি বড্ড খারাপ জিনিস, যা তাদের জন্য নয়। কিন্তু তারা সেগুলো গা করে না। কেননা, তারা মনে করতো ফেরেশতাদের এরূপ কোনো আসক্তি নেই। কিন্তু তারা বুঝতেই পারিনি, এ ধরনের আসক্তি তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে বলেই পৃথিবীতে যাওয়া ও খুব কাছ মানুষের জীবন পর্যবেক্ষণ করার ইচ্ছাটির উদ্ভব হয়েছে।

যেহেতু ফেরেশতারা নারী-পুরুষ দুটোর কোনোটাই নয়, তাই তাদের দুজনের একজনকে পুরুষ আর অন্যজনকে নারী করে প্রেরণ করা হলো পৃথিবীতে। দুজনকেই করে দেওয়া হলো অনিন্দ্য সৌন্দর্যের অধিকারী। তাদেরকে স্বামী-স্ত্রী করে পাঠানো হলো নশ্বর পৃথিবীতে। প্রথমদিকে ভালোভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল তাদের। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে পরিবর্তন এলো। বিস্মৃতি ঘটল তাদের। মানুষের গুণাবলি দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছিল বলে একটা সময় তারা একে অপরের প্রেমে পড়ে যান। সেই প্রেম তাদেরকে এমনভাবে আসক্ত করে করে ফেলল যে, তারা একেবারেই ভুলে গেল যে তারা আসলে মানুষ নয়, ফেরেশতা–আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করাই তাদের কাছ, যাদের কিনা কোনো প্রকার আসক্তি থাকতে নেই।

এ ব্যাপারে তাদেরকে পূর্বেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষমেশ তারা তা ভুলে বসে এবং সেই বাণীটিই সত্যি হয়ে যায়। উক্ত অনিন্দ্য সুন্দরী নারী ও অতি সুদর্শন পুরুষরূপী ফেরেশতা দুজনের মধ্যকার প্রেম থেকেই জন্ম হয় মাদার পীরের। জনশ্রুতি রয়েছে, পীর মাদারের জন্মের পরই খোদার ইচ্ছাতে পুনরায় ফেরেশতা দুজনের সম্বিৎ ফিরে আসে। নিজেদের ভুলে যাওয়া সত্ত্বাটির কথা মনে করতে পারে তারা। আর তখনই নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ভীষণ লজ্জিত বোধ করে। এ সময় তারা পৃথিবী ত্যাগ করে পুনরায় আসমানে–তাদের আপন নিবাস ও কর্মক্ষেত্র, ফিরে যান। কিন্তু শিশু পীর মাদার রয়ে গেল পৃথিবীতে।

এ তো গেল পীর মাদারের জন্মের পেছনকার কথকথা। তার বেড়ে ওঠা নিয়ে প্রচলিত আছে আরো একটি গল্পের, যা শুনলে হয়তো আপনার চোখ কপালে উঠতে পারে। কথিত আছে, একবার কানকূপের গহীন অরণ্যে শিকারের উদ্দেশ্যে আসেন হযরত আলি (রা.)। শিকারের সন্ধানে অরণ্যের ভেতর ঘুরতে থাকেন তিনি। ঘুরতে ঘুরতে একসময় জঙ্গলের একাংশে গিয়ে হাজির হোন, যেখানে তিনি এক শিশুকে দেখেন। গহীন জঙ্গলের ভেতরে শিশুটিকে দেখে এগিয়ে যান আলি। যখন তার বাবা-মায়ের খোঁজ করার পর তেমন কিছুই উদ্ধার করতে পারলেন না, তখন শিশুটিকে সাথে করে নিজ গৃহে নিয়ে এলেন। আলি ও মা ফাতেমা কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটিকে নিজেদের

পুত্রজ্ঞান করে লালনপালন করতে থাকেন। এই শিশুটিই পরবর্তীতে মারফতি তরিকায় কঠোর সাধনা করার মধ্য দিয়ে সিদ্ধি লাভ করে হয়ে ওঠে মাদার পীর। এসমে আজমের মাধ্যমে দম বা শুমার ধরে অনেক অসাধ্যকে সাধনের শক্তি অর্জন করেন। অর্জিত এ শক্তি বা মাহাত্ম্য মানবকল্যাণে লাগানোর জন্যই দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

পীর মাদারের কেরামতিগুলো নিয়ে রচিত হয়েছে বেশ কিছু পালা। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পালাগুলো হলো–জিন্দাশাহ মাদার, আসকান মাদার, তালেমুল মাদার, খাতেমুল মাদার, সমশের গোলাব প্রভৃতি। একেকটি পালায় একেকভাবে আবির্ভাব ঘটতে দেখা যায় পীর মাদারের। যেমন–সমশের গোলাব পালায় পীর মাদারকে বড়োপীর আবদুল কাদির জিলানির সাথে রুহানি বা আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে পাল্লা দিতে দেখা যায়।

মাদার পীরের কেরামতি নিয়ে মাদার পীরের শিষ্যদের মাঝে সবচেয়ে বেশি যে কাহিনিটি প্রচলিত সেটি আরো বিস্ময়কর। কথিত আছে, সেই সময় ছিলছত্র নামে একজন রাজা ছিল। তার দেশ ছিল আরব মুলুক থেকে অনেক অনেক দূরে, সাত সমুদ্র তেরো নদীর অপরপারে। একবার রাজা ছিলছত্র শিশু ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনকে চুরি করে নিয়ে যায় নিজের দেশে। এ খবর শোনার পর হাসান-হোসেনকে মুক্ত করতে সেই দেশে যান মোহাম্মদ হানিফা। হানিফার সাথে ভীষণ যুদ্ধ হয় ছিলছত্রের সেনাদের। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত তিনিও বন্দি হোন রাজা ছিলছত্রের সৈন্যদের হাতে। তাকে প্রেরণ করা হয় কারাগারে। এই সংবাদটি পীর মাদারের কানে গেলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হোন এবং ইমাম হাসান-হোসেন ও আবু হানিফাকে মুক্ত করতে ছুটে যান। শুরু হয় আবার লড়াই। কিন্তু এবার রাজা ছিলছত্র পেরে উঠলো না। হার মানলো পীর মাদারের কাছে। পীর মাদার তাকে বন্দী করে। কিন্তু হাসান-হোসেনকে কোথায় বন্দী করে রাখা হয়েছে সেই তথ্য কোনোভাবেই ছিত্রছত্রের মুখ থেকে বের করা গেল না। এমতাবস্থায় অনেক বড়ো সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলেন পীর মাদার। রাজাকে বন্দী করেছেন ঠিকই, কিন্তু যেসবের জন্য এতকিছু সেই জিনিসটাই এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। শুরু করলেন অনুসন্ধান, যাকে আমরা বলি চিরুনি তল্লাশি। কিন্তু কোনো লাভ হলো না তাতে। শেষ পর্যন্ত পীর মাদার নিজের ঝোলার মধ্যে রাজা ছিলছত্রের গোটা রাজ্যটাকেই তুলে নিয়ে ফিরে এলেন আরব মুলুকে। সোজা গিয়ে উপস্থিত হলেন মা ফাতেমার সামনে, মেলে ধরলেন ঝোলা কাঁধের ঝোলাটি এবং বললেন নিজের পুত্রদেরকে ঝোলার ভেতরে থাকা রাজ্যটি থেকে খুঁজে নিতে। শেষমেশ, মা ফাতেমা তার পুত্রদ্বয়কে ঝোলার ভেতর থেকে খুঁজে

বের করে নিলেন। অবশ্য ধর্মীয় দিক থেকে এই কাহিনিগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। এগুলো কেবলই প্রচলিত লোককাহিনি বা কিংবদন্তী মাত্র।

কথিত আছে, পীর মাদার নাকি অশরীরী অবস্থায় মেঘের মধ্যেও আত্মগোপন করার আলৌকিক ক্ষমতা রাখেন।

মাদার গান কিংবা মাদার বাঁশের জারি নাটোর জেলার চলনবিল অঞ্চলের নিজস্ব লোকসঙ্গীত হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের অন্য কোনো অঞ্চলে এ গানের আসর বসলেও তা মূলত নাটোর জেলা থেকেই ধার করে নেওয়া। বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, কেরানিগঞ্জ, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বিক্রমপুর, নেত্রকোনাসহ আরো কয়েকটি অঞ্চলে মাদারের বাঁশ তোলা ও মাদার বাঁশের জারি প্রচলিত আছে।

মাদার গানের জারিতে মাদার পীরের প্রতীক হিসেবে একটি বাঁশ ব্যবহার করা হয়। প্রধান বয়াতি গান গাইতে গাইতে বাঁশঝাড়ে গিয়ে একটি ধারালো ছুড়ি দিয়ে এক কোপে একটি বাঁশ কাটেন। এরপর বাঁশটিকে নদীতে স্নান করিয়ে লাল কাঁপড় দিয়ে বেঁধে গৃহস্থ বাড়ীর নির্দিষ্ট আসনে উঁচু স্থানে স্থাপন করেন। বাঁশটিকে মাটি স্পর্শ করতে দেওয়া হয় না। লোকজন তাদের মনবাসনা পূরণের জন্য আসনে বসে প্রার্থনা করতে থাকেন। প্রার্থনা শেষে একটি খোলা স্থানে পাটি বিছিয়ে মাদার পীরের বন্দনা করে পালাগান শুরু করেন বয়াতি।

'যেজন আলেক চিন্নাছে।
তার কিরে ভয়,
যে জন আলেক চিন্নাছে।'

গানের প্রধান চরিত্র মাদার পীর ও তাঁর শিষ্য জুমল শাহ। এছাড়া থাকেন কয়েকজন দোহার-বায়েন। সবাই গোল হয়ে একটি পাটিতে বসেন যাদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে মাদার পীর ও জুমল শাহ গান গাইতে থাকেন।

'খাঁটি মুরিদ যারা,
আলেক চিনেন তারা'।

মাদার পীর নামে কোনো পীরের দরগা বা মাজার পৃথিবীর কোথাও নেই, তবু মাদার পীরের নামে মানত বা মানসিক করার চল রয়েছে সর্বত্র। এসব মানত মাদার পীরের শিষ্যদের মাজারে দেয়া হয়ে থাকে। সন্তান কামনায়, রোগ-

শোক থেকে মুক্ত লাভ, কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদের হাত থেকে উদ্ধার প্রাপ্তির আশায় লোকে মাদার পীরের নামে মানসিক করে। তারা পীরের দোহাই দিয়ে মানত করে যে, বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে বা মনস্কামনা পূরণ হলে মাদার গানের আসর বসাবে।

মাদার আইলো না রে
ফকির পিতাসে
দম দম বলিয়া মাদার
সবাই দেইখাছে।
মাদার আইলোনারে–

এটি হলো মাদার বাঁশ বা দামাইলের অপেক্ষায় থাকা গৃহস্থঃ ঘরের বৌঝিদের গান। মাঘ মাসে যখন শীতের শুরু হয়, তখন বাড়ির ছেলেমেয়েরা ঠান্ডা, খুজলিপাঁচড়াসহ নানাবিধ মৌসুমি রোগবালাইয়ে আক্রান্ত হয়। তা নিয়ে মা-বোনেদের দুশ্চিন্তার শেষ থাকে না। ব্যাপারটা নিয়ে তারা অত্যন্ত ভীত থাকেন। তাদের ধারণা, দামাইল এলে এসব রোগবালাই ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়। কাজেই তারা অপেক্ষায় থাকে দামাইল আসার।

তবে মাদার মুনি নামে আরেকজন পীরের দেখা মেলে বাংলাদেশের মানিকগঞ্জে। তাকে কেন্দ্র করেও প্রচলিত রয়েছে বেশকিছু কিংবদন্তী। কথিত আছে, মাদার মুনি একদিন হাঁটতে বের হলে একদল বালক তাকে ভণ্ড ফকির বলে তিরস্কার করতে থাকে। তিনি তখন বালকদেরকে *মীর মোদী* নাম বলতে বলল। বালকরা নামটা উচ্চারণ করা মাত্র প্রত্যেকের মস্তক ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরে অবশ্য তিনি বালকদের মস্তক তাদের দেহের সাথে জুড়ে দিয়েছিলেন। দেহের সাথে ছিন্ন মস্তকজুড়ে দেওয়ার পর যখন বললেন, যাও তোমরা জীবিত হয়ে যার যার ঘরে ফিরে যাও, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বালকের দেহে প্রাণ ফিরে এলো।

বড়োপীরের সাথেই মাদার মুনির ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে জনশ্রুতি আছে। মাদার মুনির ভক্তরা বলে থাকে বড়োপীরকে তিনি নাকি নানা সম্বোধন করতেন। নানা-নাতির মধ্যে চলতো আধ্যাত্মিক তামাশা। একবার বড়োপীরের বাড়িতে বেড়াতে গেলে তিনি মাদার মুনিকে বলেন, "ভাই মাদার, তোমার সাথে লুকোচুরি খেলতে চাই। আমি পালাবো তুমি আমায় খুঁজে বের করবে। আবার তুমি পালাবে, আমি তোমায় খুঁজে বের করবো।" প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন মাদার মুনি। প্রথমপালা বড়োপীরের। তিনি

আত্মগোপন করলেন। মাদার মুনি সারা পৃথিবী তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। বাদ গেল না আসমানও। শেষমেশ বেহেশত থেকে বের করে আনলেন তারা নানাজানকে। এবার মাদার মুনির পালা আত্মগোপন করার পালা। তিনি তাই করলেন। বড়োপীর তাকে সর্বত্র খুঁজলেন। কিন্তু কোনো হদিশ পেলেন না। পৃথিবী, আকাশমণ্ডল, পানির নিচের রাজ্য–কিছুই বাদ রাখলেন না। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষমেশ হতাশ হয়ে বড়োপীর বলল, "ভাই মাদার মুনি, তোমার কাছে আমি পরাজিত হয়েছি। এবার তুমি বেরিয়ে এসো।" একথা বলার পর মাদার মুনি হাজির হলেন বড়োপীরের সামনে। এতক্ষণ কোথায় লুকিয়ে ছিল বড়োপীর তার কাছে তা জানতে চাইলে তিনি বললেন, "বাতাস রূপে নাসিকা পথে আমি আপনার মস্তিষ্কের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম।" একথা শুনে বড়োপীর বললেন, "তুমি ভাই দমের মাদার।" সেই থেকে তার আরেক নাম হলো দমের মাদার।

মাদার মুনিকে নিয়ে আরো একটা কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে। বলা হয়, দামেস্ত রাজার একটি পুত্র মারা যায়। মাদার মুনি ঐ পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আযরাইলের সাথে তার দেখা। তিনি আযরাইলকে জান চোর বলে সম্বোধন করে বলেন, "তুই মানুষের জান কবজ করিস, কিন্তু জানের যে একটা চেহারা থাকে তা কি কখনো দেখেছিস?" প্রত্যুত্তরে আযরাইল তাকে জানায়, "না, তো! জানের যে একটা চেহারা থাকে আমি তো তা জানিই না।" মাদার মুনি তখন তাকে বলে, "তোর হাতে থাকা জানটা আমাকে দে, আমি তো জানের চেহারা দেখাচ্ছি।" এভাবেই চালাকি করে আযরাইলের কাছ থেকে ভক্তের জান নিজের কুক্ষীগত করেন ও পরে তা রাজার পুত্রের দেহে স্থাপন করেন বলে মাদার মুনির ভক্তদের মধ্যে জনশ্রুতি রয়েছে।

পীর মাদার ও মাদার মুনিকে কেউ কেউ একই ব্যক্তি বলে মনে করেন। আবার কেউ কেউ বলে দুজনেই আলাদা পীর ছিলেন।

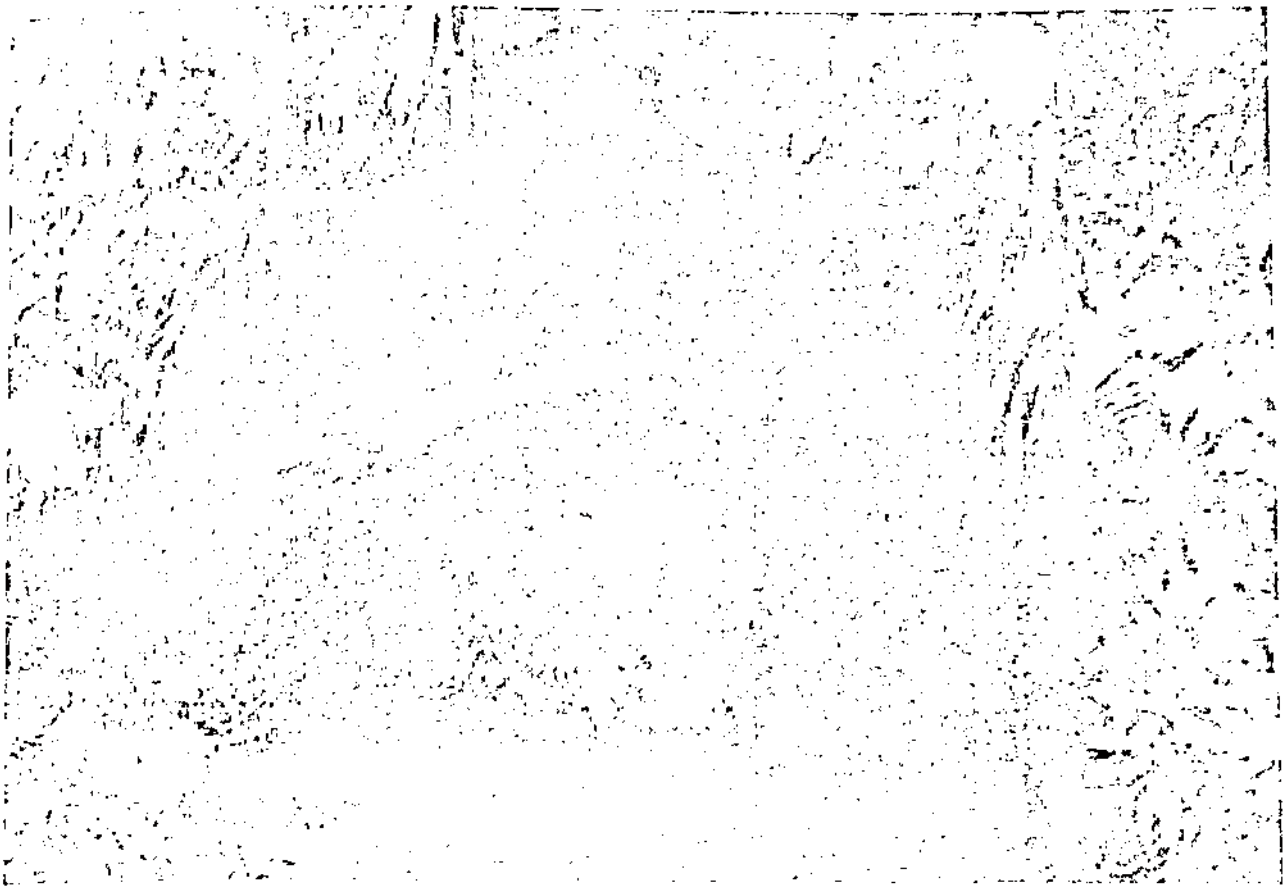

সমন্বিতরূপ। হারং শব্দের অর্থ 'সাঁকো' বা 'কোথাও যাওয়ার বিকল্প পথ', আর হুরুং শব্দের অর্থ 'সুড়ঙ্গ'। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে 'হারংহুরুং' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'কোথাও যাওয়ার বিকল্প সুড়ঙ্গ পথ'। আর এই সুড়ঙ্গটিকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে প্রচলিত আছে একটি কিংবদন্তী। বলা হয়ে থাকে, আনুমানিক ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে হজরত শাহ জালালের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে রাজা গৌড় গোবিন্দ নিজের সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে নিয়ে এই সুড়ঙ্গ পথেই পলায়ন করেছিলেন। তারপর থেকে আর কখনোই তাদের কারোর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি; যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

চৌদ্দ'শ শতকের কথা। বর্তমান সিলেট তখন পরিচিত ছিল শ্রীহট্ট নামে। এটি ছিল গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সেই সময় এ অঞ্চলের রাজা ছিল গোবিন্দ, ইতিহাসে যে কিনা গৌড় গোবিন্দ নামেই সর্বাধিক পরিচিত। রাজার নামের আগে রাজ্যের নাম যুক্ত করেই 'গৌড় গোবিন্দ' নামের অবতারণা।

আদিকাল থেকেই জাদুটোনার জন্য এ রাজ্যটির ছিল বিশেষ খ্যাতি। রাজা নিজেও ছিল জাদুটোনার মতো অলৌকিক কারসাজীতে একেবারে সিদ্ধঃহস্ত। ধর্মীয় দিক থেকে সে ছিল ভীষণ গোঁড়া। সেই সাথে অন্য ধর্মের প্রতি ছিল অসহিষ্ণু। এদিক থেকে ঐ সময়ে তার সমকক্ষ দ্বিতীয় কেউ ছিল না বললেই চলে। রাজার কড়া নির্দেশ ছিল–তার রাজ্যে কোনোভাবেই গো-হত্যা করা চলবে না।

সেই সময় হিন্দু অনুশাসিত এই রাজ্যটির অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমান হবিগঞ্জ টুলকিকর মহল্লা। সেখানে বসবাস করতো কয়েক ঘর মুসলিম পরিবার। এভাবেই কেটে যাচ্ছিলো দিন।

রাজা একদিন তার অন্দরমহলের বারান্দায় আরাম করছিল। এমন সময় কোথা থেকে একটি কাক উড়ে এসে বসলো তার বারান্দার রেলিঙয়ের ওপর। ঠোঁটে ছিল এক টুকরো মাংস। বিধিবাম, মাংসের টুকরোটি পড়লো গিয়ে গৌড় গোবিন্দের সামনে। ব্যস আর যায় কোথায়! টুকরোটি যে গরুর মাংসের তা বুঝতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হলো না রাজা গোবিন্দের। পেয়াদা ডেকে নির্দেশ দিলেন গরুর মাংসটির উৎস খুঁজে বের করতে। রাজ আজ্ঞা পাওয়া মাত্রই শুরু হয়ে গেল অনুসন্ধান কাজ। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ধরা পড়লো অপরাধী। সেই অপরাধী আর কেউ নয়, টুলকিকরের অধিবাসী শেখ বুরহানুদ্দিন। শোনা যায়, সন্তানহীন বুরহানুদ্দিন স্রষ্টার কাছে বহু মানতের পর বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছিলেন। সেই সন্তানের আকিকা করতে গিয়ে রাজার কড়া নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও গোপনে একটি গরু জবেহ্

করেছিল। আর সেটাই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার জন্য।

যদিও গল্পটি আরেকভাবেও শোনা যায়। তাতে বলা হয়–বুরহানুদ্দিন তার সন্তানের আকিকায় গোপনে একটি গরু জবেহ্ করলে, দূর্ভাগ্যবশত একটা চিল সেখান থেকে জবেহ্ করা গরুটির এক টুকরো হাড় নিয়ে যায় খাওয়ার জন্য। হাড়টি ঠোঁটে করে চিলটি যখন নিজের নীড়ে ফিরছিল, পথিমধ্যে ঠোঁট থেকে হাড়ের টুকরোটি পড়ে যায় এক ব্রাহ্মণের বাড়ির উঠোনে। হাড়ের টুকরোটি দেখে ব্রাহ্মণ ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়। ব্যক্তিগতভাবে শুরু করে অনুসন্ধান। খোঁজ পাওয়া যায় টুলকিকরের অধিবাসী বুরহানুদ্দিনের। তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ রাজবাড়ির দিকে ছুটে। সেখানে বুরহানুদ্দিনের নামে রাজা গৌড় গোবিন্দের দরবারে নালিশ করে। এ খবর রাজার কানে পৌঁছামাত্র তিনি বুরহানুদ্দিনকে বন্দী করে রাজবাড়িতে হাজির করার পেয়াদাকে নির্দেশ দেন। সঙ্গে তার শিশুপুত্রটিকেও নিয়ে আসতে বলেন।

আবার অনেকে বলে, চিলটি ব্রাহ্মণের বাড়িতে নয়, বরং একটি মন্দিরের সামনে গরুর মাংসের টুকরো ফেলেছিল। আর তা ঐ মন্দিরের পুরোহিতের নজরে আসে। যদিও পুরোহিত জানতো না মাংসের টুকরোটি চিলের মাধ্যমে এসেছে। তিনি মনে করেন কেউ ইচ্ছাকৃত কাজটি করেছে। তাই এমন আচরণে তিনি ভীষণ ক্রোধান্বিত হোন এবং রাজা গৌড় গোবিন্দের দরবারে নালিশ করেন। রাজা তার লোকেদের নির্দেশ দেয় যে, যেখান থেকে পারো সেই অপরাধীটিকে বন্দী করে রাজ দরবারে হাজির করো। রাজার নির্দেশে অনুসন্ধান শুরু হলে দোষী সাব্যস্ত করা হয় বুরহানুদ্দিনকে। তাকে হাজির করা হয় রাজ দরবারে।

ঘটনার সূত্রপাত অবশ্য যেভাবেই হোক না কেন, সব ক'টা গল্পেই বুরহানুদ্দিনের পরিণতি ছিল একই–তাকে দোষীসাব্যস্ত করে রাজার সম্মুখে হাজির করা হয়।

গো-হত্যার মতো ঘোরতর অপরাধে বুরহানুদ্দিনকে বন্দী করে নিয়ে আসা হলে বিচার বসলো রাজদরবারে। প্রহসনের সেই বিচারে তাকে দোষীসাব্যস্ত করে ভয়ঙ্কর এক শাস্তির রায় প্রদান করা হলো। বুরহানুদ্দিনের ডানহাতটি কেটে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হলো। শুধু তাই নয়, তার নিষ্পাপ শিশুপুত্রটিকেও হত্যার নির্দেশ দিলেন নির্দয় রাজা। সেদিন সেখানে উপস্থিত কেউই রাজদণ্ডের বিরোধিতা করেনি। রাজার আদেশের বিরোধিতা করে সেই সাধ্য খুব কম লোকেরই থাকে।

নির্দেশমতো কেটে ফেলা হলো বুরহানুদ্দিনের ডানহাত। হত্যা করা হলো তার শিশুপুত্রকে। এমন ঘোরতর অন্যায়ের বিচার চেয়ে শেখ

বুরহানুদ্দিন হাজির হলো সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের দরবারে। তার সাথে ঘটা অন্যায় ঘটনাটি পেশ করলো সুলতানের দরবারে। তার কাছে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করলো। বুরহানুদ্দিনের মুখ থেকে সবটা শুনে সুলতান ভীষণ ব্যথিত হলেন। তিনি নিজের ভাতিজা সিকান্দার খান গাজীকে নির্দেশ দিলেন অত্যাচারি রাজা গৌড় গোবিন্দের রাজ্য আক্রমণ করে তাকে পরাজিত ও বন্দী করতে।

কথিত আছে, সিকান্দার খান গাজী আক্রমণের উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশ করলে রাজা গৌড় গোবিন্দ জাদুবলে শাহের সৈন্যবাহিনীর ওপর অগ্নিবাণ ছুঁড়তে শুরু করে। রাজার ছোড়া অলৌকিক বাণে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সৈন্যরা যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো। পরাজিত হলো ফিরোজ শাহের বাহিনী। কিন্তু অভিযান থেমে রইলো না। আবারও আক্রমণ করলো সিকান্দার খান গাজী। কিন্তু রাজার জাদুশক্তির কাছে হার মানতে হলো তাকে। পর পর দু'বার গৌড় গোবিন্দের রাজ্য আক্রমণ করেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হলো সিকান্দার খান গাজীকে। সুলতান তখন তার সিপাহশালার সৈয়দ নাসিরুদ্দিন শাহকে পাঠান গৌড় গোবিন্দকে শায়েস্তা করার জন্য। সৈন্য নিয়ে গৌড় গোবিন্দের রাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে নাসিরুদ্দিন শাহ অগ্রসর হলে, পথিমধ্যে সোনারগাঁওয়ের কাছে হযরত শাহ জালালের সাথে দেখা হয় তার। দিল্লি থেকে ৩৬০ জন অনুসারী নিয়ে সবে তিনি বাংলায় প্রবেশ করেছেন। তার কাছ থেকে বুরহানুদ্দিনের সাথে ঘটা হৃদয় বিদারক ঘটনাটি শুনে হযরত শাহ জালালও মর্মাহত হোন। নিজের অনুসারীদের নিয়ে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

অন্য একটি ঘটনায় বলা হয়, সুলতান ফিরোজ শাহের বাহিনী গৌড় গোবিন্দের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে বুরহানুদ্দিন দিল্লীর দিকে রওনা হোন। হযরত শাহ জালাল ঐ সময় দিল্লীতেই অবস্থান করছিলেন। বলা হয়, তাদের দুজনের সেখানেই সাক্ষাৎ হয় এবং বোরহানুদ্দিনের কাছ থেকেই তার সাথে হওয়া অন্যায়ের বিবরণ শোনেন। পরবর্তীতে বোরহানুদ্দিনকে সাথে নিয়ে বাংলায় আসেন হযরত শাহ জালাল এবং সুলতান ফিরোজ শাহকে পুনরায় গৌড় গোবিন্দের রাজ্য আক্রমণের অনুরোধ জানান। হযরত শাহ জালালের কথায় সুলতান নিজের সিপাহশালার সৈয়দ নাসিরুদ্দিন শাহকে আবারও গৌড় গোবিন্দের রাজ্য আক্রমণের নির্দেশ দেন।

হযরত শাহ জালাল সুলতানের সৈন্যদলের সঙ্গে শ্রীহট্টের উদ্দেশ্যে রওনা হোন। ব্রহ্মপুত্রের তীরে পৌঁছে দেখলেন নদী পার হওয়া সব ব্যবস্থা রাজা পূর্বেই বন্ধ করে রেখেছেন। নদীতে কোনো নৌকাই নেই। এমতাবস্থায়

নদী পার হওয়া সম্ভব নয়। আর যদি নদী পার না হওয়া যায়, তাহলে গৌড় গোবিন্দের রাজ্য আক্রমণও সম্ভব না। কথিত আছে, এমন সঙ্কট যখন উপস্থিত, তখন সেটির সমাধান দিয়েছিলেন হযরত শাহ জালাল। জনশ্রুতি রয়েছে, তিনি নাকি নামাজ পড়ার জায়নামাজটি ব্যবহার করে নিজের সঙ্গীসাথীদেরকে নিয়ে নদী পার হয়েছিলেন। কিন্তু নদীর মাঝামাঝি পৌঁছতেই রাজার জাদুকরেরা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে অগ্নিবাণ ছুড়তে লাগলো। হযরত শাহ জালালও নিজের অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োগ করলেন। অন্ধকার জালের সৃষ্টি করে প্রতিহত করলেন শত্রুদেরকে। এমতাবস্থায় রাজার সৈন্যরা ভয় পেল। রাজা গোবিন্দ নিজেও ভয় পেয়ে গেল। পিছু হটে নতুন করে অবস্থান গ্রহণ করলো তারা।

শাহ জালাল সঙ্গীদেরকে নিয়ে যখন বরাক নদীর পাড়ে পৌঁছুলেন, দেখলেন পূর্বের মতো এখানেও নদী পারাপারের কোনো ব্যবস্থা নেই। অগত্যা আবারও জায়নামাজ ব্যবহার করে একইভাবে নদী পার হতে হলো তাদেরকে। শাহ জালালের সিলেট অঞ্চলে প্রবেশের উল্লেখ রয়েছে প্রাচীন গ্রন্থ তোয়ারিখে জালালীতে। সেখানে উল্লেখ আছে–

চৌকি নামে ছিল যেই পরগণা দিনারপুর
ছিলটের হর্দ্দ ছিল সাবেক মসুর
সেখানে আসিয়া তিনি পৌঁছিলা যখন
খবর পাইলা রাজা গৌবিন্দ তখন।
এপারে হজরত তার লস্কর সহিতে
আসিয়া পৌঁছিলা এক নদীর পাড়েতে
বরাক নামে নদী ছিল যে মসুর
যাহার নিকট গ্রাম নাম বাহাদুরপুর।
যখন পৌঁছিলা তিনি নদীর কেনার
নৌকা বিনা সে নদীও হইলেন পার।

কথিত আছে, শাহ জালাল ও তার সঙ্গীদেরকে আটকানোর জন্য সব ধরনের কলাকৌশল ব্যবহার করে রাজা গৌড় গোবিন্দ। কিন্তু যখন দেখলেন তার সবরকম প্রয়াসই শাহ জালালের কারণে বিফল হয়ে যাচ্ছে, তখন শেষ চেষ্টা হিসাবে এক প্রকাণ্ড মন্ত্রপূত লোহার ধনুক শাহ জালালের কাছে প্রেরণ করলেন। শর্ত দিলেন যদি কেউ একা উক্ত ধনুকের জ্যা ছিন্ন করতে পারে তবে গোবিন্দ রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে। শাহ জালাল তার দলের লোকদের

ডেকে বললেন, যে ব্যক্তির সমস্ত জীবনে কখনো ফজরের নামাজ কাজা করেনি বা বাদ পড়েনি একমাত্র সেই পারবে গোবিন্দের লোহার ধনুক 'জ্যা মুক্ত' করতে। সৈন্যদলের ভেতর অনুসন্ধান করে সিপাহসালার সৈয়দ নাসিরুদ্দীনকে উপযুক্ত হিসাবে পাওয়া গেল এবং তিনিই ধনুক জ্যা মুক্ত করলেন। চারদিকে জয়ধ্বনির শব্দে কেঁপে উঠলো গৌড় গোবিন্দের সিংহাসন। একইভাবে জায়নামাজ ব্যবহার করে সুরমা নদী পার হয়ে সিলেট শহরে প্রবেশ করলেন শাহ জালাল। নিজের পরাজয় কোনোভাবেই ঠেকানো সম্ভব নয় দেখে গৌড় গোবিন্দ রাজবাড়ি ত্যাগ করে পেচাগড়ের গুপ্তগিরি দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরপর আর কখনো দেখা মেলেনি রাজা গৌড় গোবিন্দের।

কথিত আছে, হযরত শাহ জালালকে তার মামা ও গুরু এক মুঠো মাটি দিয়ে বলেছিলেন যেখানের মাটি এই মাটির ঘ্রাণ ও স্বাদযুক্ত হবে সেখানেই আস্তানা গাড়বে ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে। অবশেষে তিনি খুঁজে পেলেন নিজের লক্ষ্যস্থল। সিলেট হলো ৩৬০ আউলিয়ার দেশ। হারিয়ে গেল অত্যাচারী রাজা গৌড় গোবিন্দ।

জনশ্রুতি রয়েছে, শাহ জালালের কাছে পরাজিত হয়ে রাজা একটি সুড়ঙ্গ পথ ধরে পালিয়ে গিয়েছিল। 'মালনীছড়া টি এস্টেট'-এ এখনো একটি সুড়ঙ্গ রয়েছে, যেটি স্থানীয়দের কাছে হারংহুরং গুহা নামে পরিচিত। স্থানীয়রা বিশ্বাস করে, এই সুড়ঙ্গ দিয়েই রাজার গৌড় গোবিন্দ পালিয়ে গিয়েছিলেন। সুরঙ্গের মুখটি মালনীছড়া চা বাগানে থাকলেও এর শেষ কোথায় কেউ তা জানে না। চা বাগানের হিন্দু শ্রমিকেরা বিশ্বাস করে যে, বহু পুরোনো এই গুহাটিতে এখন ৩৩ কোটি দেবদেবীর বসবাস করে। তাই চাইলেই যে কারোর পক্ষে এটি পার হওয়া সম্ভব নয়। কেউ যদি এটির শেষ মাথায় পৌঁছাতে চায় তবে তাকে ৩৩ কোটি দেবদেবীর প্রত্যেকজনকে ১ টাকা করে দক্ষিণা প্রদান করে খুশি করতে হবে। তবেই পৌঁছা যাবে সুড়ঙ্গটির শেষ মাথায়। রাজা গৌড় গোবিন্দও নাকি এভাবেই পার হয়েছিলেন। ছোট্ট এই সুড়ঙ্গটির দেখতে গেলে এটির প্রবেশ পথের কাছাকাছি মোমবাতির অস্তিত্ব চোখে পড়লেও পড়তে পারে আপনার।

শোনা যায়, অনেকেই সুড়ঙ্গটির ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কেউই শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি। অনেকে বলে থাকেন সুড়ঙ্গটি নাকি জৈন্তা পর্যন্ত চলে গেছে। যারাই আজ পর্যন্ত সুড়ঙ্গটির ভেতরে প্রবেশ করেছে, তারা আর কখনোই জীবিতাবস্থায় ফিরে আসেনি। আর যদি কেউ সৌভাগ্যক্রমে ফিরে আসেও, তাহলে কিছুদিনের মধ্যে অপ্রকৃতস্থ হয়ে মারা গেছে। জনশ্রুতি রয়েছে, একবার ভারত থেকে তিনজন তান্ত্রিক এখানে

এসেছিলেন। তারা সুড়ঙ্গটির ভেতরে প্রবেশ করেছিল। তাদের ভেতর থেকে মাত্র একজন ফিরে আসতে পেরেছিল, তবে অল্পদিনের মধ্যেই মারা গিয়েছিল লোকটি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে অস্বাভাবিক আচরণ করে বেড়াত। এছাড়াও সিলেটের একজন ধনীব্যক্তি একবার সুড়ঙ্গটি খননের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল বলেও শোনা যায়। কিন্তু কাজ শুরু পরপরই আবার তা বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। লোকটি নাকি অস্বাভাবিক সব স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন সংস্কার কাজটি শুরু হওয়ার পর থেকে। স্থানীয় এক ব্যক্তিও নাকি যুবক বয়সে সুড়ঙ্গটির ভেতরে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু যখন বেরিয়ে এসেছিল তখন সে পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছে।

আরো বলা হয়ে থাকে, রাজা গৌড় গোবিন্দ নাকি হজরত শাহ জালালের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে খারাপ জিনপরীদের ব্যবহার করেছিল। কথিত আছে, হজরত শাহ জালাল সেইসব দুষ্ট জিনপরীদেরকে বন্দী করেন এবং মাছ বানিয়ে দেন। শাহ জালালের মাজার সংলগ্ন জলাশয়ের যে মাছগুলো রয়েছে, জনশ্রুতি রয়েছে সেগুলো আসলে মাছ নয়, গৌড় গোবিন্দের সেইসব দুষ্ট জিনপরীগুলো।

ফিরোজ শাহের সৈন্যদের ওপর রাজার জাদুবলে অগ্নিবাণ বর্ষণ, হযরত শাহ জালালের জায়নামাজের করে নদী পার হওয়া, মন্ত্রপূত ধনুক প্রেরণ, হারুংহুরুং সুড়ঙ্গ দিয়ে রাজার পলায়ন, সুরঙ্গে ৩৩ কোটি দেবদেবীর অস্তিত্ব থাকা, তাদেরকে খুশি করতে ১ টাকা করে ৩৩ কোটি টাকা প্রদান করে সুড়ঙ্গ পার হওয়া, রাজার অধীনস্থ জিনপরীদের মাছে পরিণত করার গল্পগুলোর ঐতিহাসিক ভিত্তি যদিও নেই, কিন্তু হজরত শাহ জালাল একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব যার হাত ধরে সিলেটে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল। রাজা গৌড় গোবিন্দ ও সুলতান ফিরোজ শাহ উভয়েই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। সোনারগাঁওয়ে সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের রাজত্বকালে (১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রি.) মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলায় এসেছিলেন। তিনি ১৩৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দে হযরত শাহ জালাল (র.)-এর সঙ্গে তাঁর খানকায় সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং সেখানে তিনদিন অবস্থানও করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। হজরত শাহ জালালের হুলিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে বতুতা তাকে বয়স্ক ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেন। এছাড়াও সিলেটে রয়েছে হযরত শাহ জালালের মাজার শরীফ। অসংখ্য ভক্ত আজও মনস্কামনা পূরণের আশায় তার মাজারে যান, মানত করেন। সিলেটে আরও রয়েছে শেখ বুরহানুদ্দিনের মাজারটিও। যদিও রাজা গৌড় গোবিন্দের ভিটের অস্তিত্ব এখন আর নেই বললেই চলে।

অনুমতি প্রার্থনা করে। রাবণ শিবভক্তদের মধ্যে ভক্তশ্রেষ্ঠ। তাই তার প্রার্থনা মুখের ওপর নাকোচ করে দেওয়াও মহেশ্বরের পক্ষে শোভনীয় নয়। তিনি তা করলেনও না। বরং রাবণের প্রার্থনাটি গ্রহণ করেন। তবে তাকে একটি শর্ত দিয়ে দিলেন তিনি, যে শর্তটি পূরণ হলেই শুধুমাত্র ভগবান পিনাকপাণি কৈলাশ ছেড়ে লঙ্কায় যাবেন বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। রাবণকে বলা হয়, তাকে একটি উর্ধ্বমুখী শিবলিঙ্গ দেওয়া হবে, যেটিকে কৈলাশ থেকে কাঁধের ওপর বহন করে লঙ্কায় নিয়ে যেতে। শুধু তাই নয়, তাকে আরো বলা হয়, লঙ্কায় পৌঁছনোর আগ পর্যন্ত কোথাও শিবলিঙ্গটিকে রাখা যাবে না। যদি শিবলিঙ্গটি কোথাও রাখা হয় তাহলে মহাদেব সেই জায়গাতেই অবস্থান করবেন। সেই স্থান থেকে শিবলিঙ্গটিকে আর ওঠাতে পারবে না। আর এতে করে রাবণ যে অভিপ্রায়টি নিয়ে কৈলাশে এসেছিল, সেটি কখনো সফল হবে না।

মহাদেবের দেওয়া শর্তটি গ্রহণ করে রাবণ। কৈলাশ থেকে পাওয়া শিবলিঙ্গটিকে নিজের কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে যাত্রা করে নিজ রাজ্য লঙ্কাপুরীর উদ্দেশ্যে।

সুদীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে রাবণ যখন মৈনাকপর্বতে এসে উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। বিষয়টা এতটাই মারাত্মক পর্যায়ে গিয়ে ঠেকে যে শিবের দেওয়া শর্তের কথাটি ভুলে গিয়ে কাঁধ থাকা শিবলিঙ্গটি মাটিতে নামিয়ে রাখতে বাধ্য হয়। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরে আসার পর রাবণ পুনরায় শিবলিঙ্গটি তোলার চেষ্টা করলো, কিন্তু আদিনাথের দেওয়া শর্তটি ভঙ্গ হওয়ায় সেই অনুযায়ী শিবলিঙ্গটি তুলতে ব্যর্থ হলো সে। তাই ইতোপূর্বে রাবণকে দেওয়া শর্তানুসারে মহাদেব তখন মৈনাকপর্বতের চূড়াতে অবস্থান গ্রহণ করলেন।

কথিত আছে, মহেশখালীতে অবস্থিত বর্তমান আদিনাথ পাহাড়টিই সেই মৈনাকপর্বত, যেখানে রাবণ শিবলিঙ্গটি রেখে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়েছিল। আদিনাথ হলো মহাদেব শিবের আরেক নাম। মৈনাকপর্বতের ওপর অবস্থিত শিবমন্দিরটিকে বলা হয় 'আদিনাথ মন্দির'। মন্দিরটির কারণেই একে স্থানীয়রা আদিনাথ পাহাড় নামে সম্বোধন করে থাকে। সেই সাথে বিশ্বাস করা হয় যে, আদিনাথ মন্দিরে যে শিবলিঙ্গটি রয়েছে, সেটি আসলে রাবণ কর্তৃক কৈলাশ থেকে আনিত সেই শিবলিঙ্গ যেটা স্বয়ং ভোলানাথ তাকে দিয়েছিল। আর এ কারণেই হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছে এই মন্দিরটি এত গুরুত্বপূর্ণ।

কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত মহেশখালী উপজেলাটি বাংলাদেশের

একমাত্র পাহাড়সমৃদ্ধ দ্বীপ। একে মহেশখালী দ্বীপ নামেও সম্বোধন করা হয়। কক্সবাজার শহর থেকে মহেশখালীর দূরত্ব মাত্র ১২ কিলোমিটার। ঠাকুরতলা হলো মহেশখালী উপজেলার গোরকঘাটা ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি গ্রাম, যেখানে এই আদিনাথ পাহাড় তথা মৈনাকপর্বত অবস্থিত। আর এই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত আদিনাথ মন্দিরটি, যাকে ঘিরে কিংবদন্তীটি প্রচলিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মন্দিরটির অবস্থান প্রায় ৮৫.৩ মিটার উঁচুতে, যেখানে পৌঁছতে হলে আপনাকে পার হতে হবে বেশ কয়েকটি সিঁড়ি; আর সেই সংখ্যাটা মোটেও কম নয়।

আদিনাথের আবিষ্কার নিয়ে স্থানীয়ভাবে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। কথিত আছে, কোনো হিন্দু নয়, বরং এই মন্দিরটি একজন সচ্ছল মুসলমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। অনেককাল এই দ্বীপে নূর মোহাম্মদ শিকদার নামে একজন সচ্ছল মুসলমানের বসবাস ছিল। একবার তিনি লক্ষ করেন, তার গোয়ালের গাভীগুলোর মধ্যে একটি গাভী হঠাৎ করে দুধ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এ ঘটনার শুরুতে রাখালকে সন্দেহ করা হলেও পরবর্তীতে কোনো কারণে রাখাল নির্দোষ প্রমাণিত হয়। কিন্তু গাভীটির দুধ না দেওয়ার বিষয়টির কোনো সমাধান হয় না। যা হোক, এক রাতে নূর মোহাম্মদের রাখাল গাভীটিকে পাহারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। সেদিন রাতেই সে একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলো। খেয়াল করলো, গভীর রাতে গাভীটি গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে এসে একটি কালো পাথরের ওপর গিয়ে দাঁড়ায়। আর তারপরই গাভীর বাট থেকে আপনাআপনি পাথরটির ওপর দুধ পড়তে থাকে। দুধ পড়া শেষ হলে গাভীটি আবার গোয়ালঘরে ফিরে যায়।

রাখালটি ভীষণ অবাক না হয়ে পারলো না। সিদ্ধান্ত নিলো পরেরদিন রাতেও পাহারা দেওয়া। পরের দিন রাতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। এভাবে পর পর তিন রাত পর্যবেক্ষণ করার পর এই অদ্ভুত ঘটনাটি সে নিজের মনিবকে জানালো। কিন্তু এ বিষয়টিকে প্রথমদিকে খুব একটা গুরুত্ব দিলো না নূর মোহাম্মদ শিকদার।

দুধ না দেওয়ার ঘটনাটি পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকায় গাভীটিকে অন্যত্র সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিলো সে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজও করা হলো। আর সেদিন রাতেই একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নের মধ্যে তাকে জানানো হলো, "গাভী সরিয়ে রাখলে দুধ দেওয়া বন্ধ হবে না। বরং সে যেন ঐ পাথরটিকে ঘিরে একটি মন্দির স্থাপন করে এবং স্থানীয় হিন্দু জমিদারদের সেখানে পুজো দেওয়ার জন্য আহ্বান করে।"

যদিও মন্দিরের ফলকে থাকা ঘটনার যে বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া যায়

সেটি কিছুটা ভিন্ন। সেখানে বলে হয়েছে, স্বয়ং নূর মোহাম্মদ শিকদার গাভীটির ওপর নজর রাখেন এবং দেখতে পান রাতের বেলায় গাভীটি মৈনাকের একটি পাথরের ওপর গিয়ে দাঁড়ালে বাট থেকে আপনাআপনিই পাথরটির ওপর দুধ পড়তে শুরু করে। এতে করে তিনি গাভীটিকে অন্যত্র সরিয়ে নেন। রাতে ঘুমাতে গেলে স্বপ্ন দেখেন পাথরটিকে কেন্দ্র করে মন্দির প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং তাকে বলা হচ্ছে স্থানীয় জমিদারদেরকে সেই মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য আহ্বান করতে।

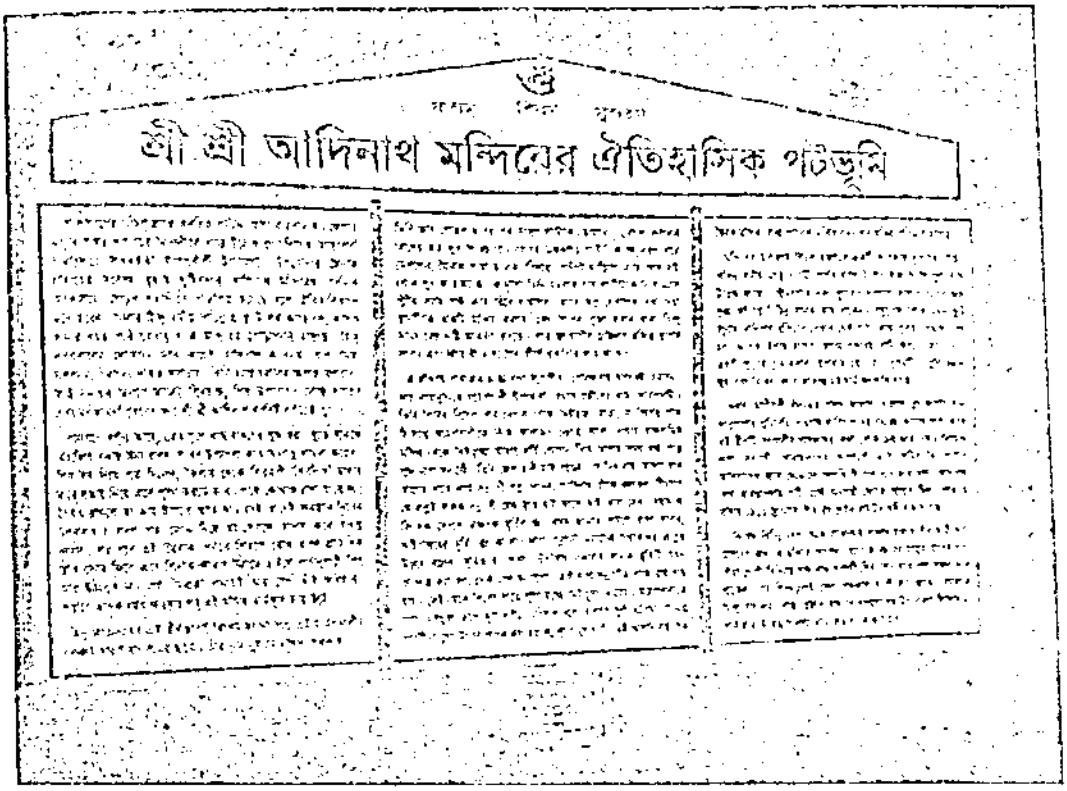
শ্রী শ্রী আদিনাথ মন্দিরের ঐতিহাসিক পটভূমি

নির্দেশ মতো নূর মোহাম্মদ শিকদার সেখানে একটি মন্দির স্থাপন করে। বলা হয়ে থাকে আদিনাথ মন্দিরই হলো একমাত্র মন্দির যেটি একজন মুসলমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। শুধু তাই নয়, মৈনাকের চূড়ায় আদিনাথ মন্দিরের পাশে অষ্টভূজারূপী দেবী দূর্গারও একটি বিগ্রহ রয়েছে। দেবী দূর্গার এই বিগ্রহটি নূর মোহাম্মদ শিকদার নিজেই নেপাল থেকে আনিয়ে এখানে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্নাদেশ পান বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

আবার এও কথিত আছে যে, এই মন্দিরে একসময় নাগা সন্ন্যাসীদের যাতায়াত ছিল। সেই সন্ন্যাসীদের একজন ছিলেন গোরক্ষনাথ। তার নাম অনুসারে মহেশখালী উপজেলা হেডকোয়ার্টারের নাম গোরকঘাটা। সেই সময়, সম্ভাবত ১৬১২ সালের দিকে, এই নাগা সন্ন্যাসীটি শিবের কাছ নির্দেশ পান নেপালের স্টেট মন্দির থেকে দেবী দূর্গার এই বিগ্রহটি চুরি করে

মহেশখালীতে নিয়ে আসার জন্য। অষ্টভুজা দুর্গা মূর্তিটি শিবের শক্তি হিসা
স্বীকৃত। যাউ হোক, বিগ্রহটি চুরি করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যবশত ধরা পড়ে য
গোরক্ষনাথ। তাকে আটক করে জেলে পাঠানো হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হ
পরদিন তার বিচার করা হবে। কিন্তু আগের রাতে যোগমায়া বলে না
সন্ন্যাসীটি শিবের কৃপাসান্নিধ্য লাভ করেন। শিব তাকে অভয়বাণী প্রদ
করেন এবং বলেন, বিচারক যখন তাকে কোনো প্রশ্ন করবে তখন সে যে
নিজের খুশি মতো কোনো একটা জবাব দেয়।

পরদিন বিচার আরম্ভ হলো। বিচারক প্রথমে নেপালের রাজার কা
চুরি যাওয়া বিগ্রহটির রং জানতে চাইলেন। জবাবে রাজা জানালেন
কষ্টিপাথরে তৈরি বিগ্রহটির রং কালো। একই প্রশ্ন চুরির অপরাধে বন্দী হও
নাগা সন্ন্যাসী গোরক্ষনাথকে করা হলে, জবাবে সে বিগ্রহটির রং সাদা ব
বিচারককে জানান। পরবর্তীতে সবার সামনে অষ্টভুজা উন্মোচন করে দে
গেল সন্ন্যাসীর কথাই ঠিক–বিগ্রহটি সাদা রঙের।

এই ঘটনায় রাজা খুবই অবাক হোন। তিনি সন্ন্যাসীর কাছে প্রকৃ
ঘটনা জানার আগ্রহ প্রকাশ করলে সন্ন্যাসী তাকে সবটা খুলে বলেন। সম্পূ
ঘটনা শুনে রাজা নিজেই মৈনাকপর্বতের চূড়ায় আদিনাথের পাশে আরেকটি
মন্দির স্থাপন করে সেই বিগ্রহটি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন।

মূল মন্দিরের পেছনে দুটো পুকুরও রয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৮০ ফুট
উঁচুতে পুকুর দুটির অবস্থান হওয়া সত্ত্বেও এর পানি কখনো শুকায় না বলে
জানা যায়। পুকুর দুটিতেও রয়েছে নাকি অলৌকিক ক্ষমতা। এগুলোতে
গোসল করলে নানাবিধ রোগ থেকে মুক্তি লাভের জনশ্রুতিও রয়েছে।

দ্বীপটির নামকরণের ক্ষেত্রেও আদিনাথের সম্পর্ক রয়েছে। আদিনাথ
যেমন শিবের একটি নাম, তেমনি শিবের আরেক নাম মহেশ। মহেশ থেকেই
দ্বীপটির নাম মহেশখালী করা হয়েছে বলেও অনেকে মত দিয়ে থাকেন।
অবশ্য অনেকের ধারণা বৌদ্ধ সেন মহেশ্বরের নাম থেকেই দ্বীপটির নাম
মহেশখালী করা হয়েছে।

জেলার নামকরণের কিংবদন্তী

ঢাকার বিভিন্ন জায়গার নামকরণের পেছনে থাকা গল্পগুলো তো আগের কিস্তিতে বলা হয়েছে। এই কিস্তিতেও বলা হয়েছে আরো কিছু জায়গার নামকরণ নিয়ে জড়িয়ে থাকা কিংবদন্তী। যা হোক, এই কিস্তিতে নতুন করে যুক্ত করা হলো জেলার নামকরণের পেছনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বা জনশ্রুতিগুলো। বিভিন্ন সূত্র থেকে এই জনশ্রুতিগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে।

।। ঢাকা জেলা ।।

ঢাকার নামকরণ নিয়ে বেশকিছু অভিমত প্রচলিত রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত আমাদের রাজধানী শহরটির নামকরণ কীভাবে ঢাকা হয়েছিল সেই ইতিহাস নিয়ে একক সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

ঢাকার নামকরণ নিয়ে বিজ্ঞজনেরা বেশ কিছু মতামত দিয়ে থাকেন। বলা হয়ে থাকে, একসময় এ অঞ্চলে প্রচুর ঢাক গাছ ছিল। ঢাক গাছে আবৃত অঞ্চলটির নাম গাছের নাম থেকেই ঢাকা হয়েছে বলে কেউ কেউ অভিমত দিয়ে থাকেন। যদিও ভিন্ন মতও রয়েছে। কেউ বা বলেন, ঢাক থেকে ঢাকা নামের উৎপত্তি। কথিত আছে সুবাদার ইসলাম খাঁ যখন এ অঞ্চলে এসেছিলেন, নিজের রাজধানীর সীমানা নির্ধারণ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যান। তখন সিদ্ধান্ত নেন ঢাক বাজানোর মাধ্যমে সীমানা নির্ধারিত হবে। যতদূর থেকে ঢাকের শব্দ শোনা যাবে, সেটি তার রাজধানীর সীমানার অন্তর্গত হবে। এই ঢাক থেকে ঢাকা নামের উৎপত্তি বলে অভিমত দিয়ে থাকেন কেউ কেউ। তবে ঢাক বাজানোর কারণ নিয়েও দ্বিমত রয়েছে। অনেকে বলেন, ইসলাম খাঁ ঢাক বাজিয়েছিলেন ঠিকই, তবে তা সীমানা নির্ধারণের জন্য নয়, বরং এ অঞ্চলে নতুন রাজধানী স্থাপন ও তা উদ্বোধন উপলক্ষ্যে। তবে ঢাক বাজানো হয়েছিল এ নিয়ে উভয়ই একমত।

এখানেই শেষ নয়। কারো কারো অভিমত, এই অঞ্চলে একসময় ঢাক ভাষা নামক একটি ভাষার প্রচলন ছিল। সেই ভাষার নাম থেকে ঢাকা

নামকরণ হয়েছে বলেও মনে করেন অনেকে।

ঢাকা শব্দের অর্থ আচ্ছাদিত, আবৃত রাখা, লুকিয়ে রাখা। কথিত আছে, রাজা বল্লাল সেন বুড়িগঙ্গার তীর ভ্রমণকালে নিকটবর্তী জঙ্গলে একটি দূর্গা প্রতিমা খুঁজে পান। তখন তিনি ঐখানে দেবী দূর্গাকে উৎসর্গ করে মন্দির স্থাপন করেন, যেটি বর্তমানে ঢাকেশ্বরী মন্দির নামে পরিচিত। বিগ্রহটি ঝোপের আড়ালে ঢাকা ছিল বলে আর এই মন্দিরের নামকরণ ঢাকেশ্বরী করা হয় বলে জনশ্রুতি রয়েছে। কালক্রমে এই দেবী হয়ে উঠেন এই জনপদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ঢাকেশ্বরী থেকেই কালের স্রোতে অঞ্চলটি ঢাকা নামে পরিচিতি পেয়েছিল বলেও মনে করা হয়।

আবার অভিমত প্রকাশ করেন যে, ঢাক্কা শব্দ থেকে ঢাকা শব্দের উদ্ভব। ঢাক্কা শব্দের অর্থ 'পাহাড়া চৌকি'। বুড়িগঙ্গার পাড়টি উত্তরাঞ্চলের শাসকেরা ঢাক্কা বা পাহারা চৌকি হিসাবে ব্যবহার করতো। সে কারণে এই অঞ্চলটি ঢাক্কা নামে পরিচিতি লাভ করে। একসময় ঢাক্কা থেকে ঢাকা হয়ে যায়।

ভারতের এলাহাবাদে গুপ্ত বংশীয় শাসনামলের একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। তাতে ডবাক নামক রাজ্যের উল্লেখ আছে। ধারণা করা হয় এই ডবাকই আজকে ঢাকা।

ঢাকার নামকরণের প্রকৃত ইতিহাস আজও উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি যে কারণে ঠিক কীভাবে শহরটির নাম ঢাকা হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা দুষ্কর।

।। ঝিনাইদহ জেলা ।।

ঝিনাইদহ পূর্বে যশোর জেলার মহকুমা ছিল। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে এটিকে পৃথক জেলা হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়।

কথিত আছে একসময় এ অঞ্চলে ঝিনুক সংগ্রহের বাণিজ্য গড়ে ওঠে। কলকাতা থেকেও ঝিনুক সংগ্রহের জন্য ব্যবসায়ীরা এখানে আসতো। ঝিনুক সংগ্রহকে কেন্দ্র করে একসময় নদী তীরে বসতি গড়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে ঝিনাইদহ নামে পরিচিতি লাভ করে। এখান থেকেই ঝিনাইদহ জেলার নামকরণ হয়েছে।

ঝিনুককে স্থানীয় ভাষায় 'ঝিনাই' বা 'ঝিনেই' বলে। আর ফার্সী শব্দ 'দহ' এর অর্থ গ্রাম। সেই অর্থে ঝিনাইদহ শব্দটির অর্থ ঝিনুকের গ্রাম।

।। নীলফামারী জেলা ।।

নীল চাষের উপযোগী হওয়ায় প্রায় দুইশত বছর আগে এ অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে নীলের খামার শুরু করেছিল ইংরেজ নীলকরেরা। ভূমি উর্বর ও নীল চাষের উপযোগী হওয়ায় দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় নীলফামারী জেলাতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নীলকুঠি ও নীল খামার গড়ে ওঠে একসময়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে দুরাকুটি, ডিমলা, কিশোরগঞ্জ, টেঙ্গনমারী প্রভৃতি স্থানে নীলকুঠি স্থাপিত হয়। মাটি উর্বর হওয়ায় সেই সময় বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের মধ্যে শুধুমাত্র নীলফামারীতেই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে শস্য উৎপাদিত হতো। আর এ কারণেই নীলকরদের আগমন ঘটে এখানে। গড়ে ওঠে অসংখ্য নীল খামার।

বর্তমান নীলফামারী শহর থেকে তিন কিলোমিটার উত্তরে, পুরাতন রেল স্টেশনের কাছেই ছিল একটি বড়ো নীলকুঠি। তাছাড়া বর্তমানে অফিসার্স ক্লাব হিসাবে যে পুরাতন বাড়িটি ব্যবহৃত হয়, একসময় সেটিও ছিল একটি নীলকুঠি। ধারণা করা হয়, স্থানীয় কৃষকদের মুখে মুখে ইংরেজদের এই 'নীল খামার' রূপান্তরিত হয় 'নীল খামারী'তে। আর এই নীলখামারীর অপভ্রংশ হিসেবে একসময় উদ্ভব ঘটে নীলফামারী নামের।

।। ঝালকাঠি জেলা ।।

এই জেলাটির নামকরণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জেলার জেলে সম্প্রদায়ের ইতিহাস।

মধ্যযুগের পরবর্তী সময়ে সন্ধ্যা, সুগন্ধা, ধানসিঁড়ি ও বিষখালী নদীর তীরবর্তী এলাকায় বসতি গড়ে তুলে জেলেরা। প্রাচীনকালে এ অঞ্চলের নাম ছিল 'মহারাজগঞ্জ'। মহারাজগঞ্জের ভূস্বামী শ্রী কৈলাশচন্দ্র জমিদারি বৈঠক সম্পাদন করতেন। পরবর্তীতে তিনি এ স্থানটিতে গঞ্জ বা বাজার স্থাপন করেন। কৈলাশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত গঞ্জে জেলেরা জালের কাঠি বিক্রি করতো। এ জালের কাঠি থেকে পর্যায়ক্রমে এ অঞ্চলের নাম ঝালকাঠি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

কথিত আছে, বিভিন্ন স্থান থেকে জেলেরা এখানে মাছ শিকারের জন্য

আসতো। যাযাবরের মতো সুগন্ধা নদীর তীরে বাস করতো। এ অঞ্চলের জেলেদের পেশাগত পরিচিতিকে বলা হতো 'ঝালো'। পরবর্তীতে জেলেরা বনজঙ্গল পরিষ্কার করে এখানে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে। এভাবেই জেলে থেকে ঝালো এবং জঙ্গল কেটে বসতি গড়ে তোলার কারণে কাটি শব্দের প্রচলন হয়ে ঝালকাটি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলেও উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এই ঝালকাটি শব্দটি রূপান্তরিত হয় ঝালকাঠিতে। ১৯৮৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী ঝালকাঠি পূর্ণাঙ্গ জেলার মর্যাদা লাভ করে।

।। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ।।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নামকরণ নিয়ে বেশ কয়েকটি জনশ্রুতি রয়েছে তেমনি একটি জনশ্রুতি রয়েছে, সেন বংশের রাজত্বকালে এই অঞ্চলে কোনো অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের বসবাস ছিল না। তাতে করে পুজো মতো বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে বাধার সৃষ্টি হচ্ছিল। কথিত আছে, সে সময় এই সমস্যাটি সমাধানকল্পে রাজা লক্ষ্মণ সেন এ অঞ্চলে আদিশূর কান্যকুব্জের মতো জায়গা থেকে থেকে বেশকিছু ব্রাহ্মপরিবার নি এসেছিলেন। এই পরিবারগুলো বংশধরদের একটি পরিবার শহরে মৌলভিপাড়া জায়গায় বাড়ি স্থাপন করেছিল বলে শোনা যায়। মনে করা হ এই ব্রাহ্মণবাড়ি থেকেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামের উৎপত্তি।

যদিও আরেক জনশ্রুতি বলে, একসময় এদিকে দিল্লি থেকে কা মাহমুদ শাহ নামে ব্যক্তির আগমন ঘটে এবং এই অঞ্চলের একস্থানে নিজে আস্তানা স্থাপন করেন। বলা হয়, এখানে যে ব্রাহ্মণপরিবারটি ছিল তি তাদেরকে বিতাড়িত করতে "ব্রাহ্মণ বেরিয়ে যাও" বলেছিলেন, যে উ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামের উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করে থাকে।

।। ফরিদপুর জেলা ।।

প্রাচীনকালে ফরিদপুর ছিল বঙ্গ জনপদের অন্তর্গত। ফরিদপুর জেলার পূর্ব নাম ছিল ফতেহাবাদ। কথিত আছে, একসময় এখানে হযরত শাহ মোহাম্ম ফরিদউদ্দিন (র.) নামে একজন বিখ্যাত সুফীসাধক ছিলেন। তিনি শ ফরিদ নামে বেশি পরিচিত।

ফরিদপুর কালেক্টরেট এলাকা সংলগ্ন যশোর রোডের পাশে শতাব্দী পুরোনো বটগাছের নিচেই ছিল এই সাধকপুরুষ শাহ ফরিদের দরগা বা চিল্লা। চিল্লার ফলক থেকে জানা যায় জনৈক পনির উদ্দিন ১৩০০ সালের দিকে চিল্লাটি নির্মাণ করেন। বিভিন্ন বইপত্র ও স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে জানা যায়, শাহ ফরিদ (র.) বিভিন্ন সময়ে নিজের শিষ্যদের নিয়ে এখানে অবস্থান করতেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধর্মীয় দিক সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। এই মানুষটির নানা কেরামতির গল্প আজও ফরিদপুরের মানুষের মুখে মুখে ঘুরে। শাহ ফরিদের দরগার সেই বটগাছটি এখন আর নেই। কথিত আছে, বটগাছটি যখন কেটে ফেলা হচ্ছিল, তখন গাছটির মাথায় আগুন জ্বলে উঠে। এই দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে যায় কাঠুরেরা। তারা কুড়োল ফেলে পালিয়ে যায় সেখান থেকে। গাছটি কাটার দায়িত্বে যে খ্রিস্টান কন্ট্রাক্টরটি ছিলেন, জনশ্রুতি রয়েছে পরবর্তীতে তিনি দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। শুধু তাই নয়, গাছটি কাটার উনিশ দিনের মাথায় ফরিদপুরে হেলিকপ্টার দূর্ঘটনা হয়েছিল, যা এই গাছ কাটার কারণেই হয়েছিল বলে স্থানীয়রা মনে করে থাকে। এসব গল্প কিংবদন্তীর ন্যায় এখানকার মানুষের মুখে মুখে ঘুরে ফিরে।

যাই হোক, ১৮৫০ সালে এসে এই ফতেহাবাদের নামকরণ করা হয় ফরিদপুর। যশোর জেলার কিছু অংশ ও ঢাকা জেলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয় নতুন জেলাটি। বলার অপেক্ষা রাখে না, সূফী হযরত শাহ ফরিদুদ্দিন (র.)-এর নামানুসারে এই জেলার নামকরণ করা হয়েছে ফরিদপুর। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে শাহ ফরিদ (র.) একজন সম্মানিত ব্যক্তি।

।। চাঁদপুর জেলা ।।

১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজ জরিপকারী মেজর জেমস রেনেল তৎকালীন বাংলার যে মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন তাতে চাঁদপুর নামক একটি অখ্যাত জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন চাঁদপুরের দক্ষিণে নরসিংহপুর নামক স্থানে চাঁদপুরের অফিসআদালত ছিল, যা বর্তমানে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গমস্থল ছিল বর্তমান স্থান থেকে পাওয়া প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে। মেঘনা নদীর ভাঙ্গাগড়ার খেলায় বর্তমানে এ অঞ্চল বিলীন হয়ে গেছে।

বারো ভূঁইয়াদের আমলে এ অঞ্চল বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদ রায়ের

জমিদারীর অংশ ছিল। চাঁদ রায়ের নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম চাঁদপুর হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

যদিও কথিত আছে, চাঁদপুরের (কোড়ালিয়া) পুরিন্দপুর মহল্লার চাঁদ ফকিরের নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম চাঁদপুর হয়েছে। তবে কারো কারো অভিমত, শাহ আহমেদ চাঁদ নামে একজন প্রশাসক দিল্লী থেকে পঞ্চদশ শতকে এখানে এসে একটি নদীবন্দর স্থাপন করেছিলেন। তাঁর নামানুসারে এই জেলার নামকরণ করা হয়েছে চাঁদপুর।

১৮৭৮ সালে প্রথম চাঁদপুর মহকুমার সৃষ্টি হয়। ১৮৯৬ সালের ১ অক্টোবর চাঁদপুর শহরকে পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৪ সালের ১৫ ই ফেব্রুয়ারী চাঁদপুর জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

।। কুমিল্লা জেলা ।।

প্রাচীনকালে এটি সমতট জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে ত্রিপুরা রাজ্যের অংশ হয়।

কুমিল্লা নামকরণের অনেকগুলো প্রচলিত লোককথা আছে, যার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য চৈনিক পরিব্রাজক ওয়াং চোয়াং কর্তৃক সমতট রাজ্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত। তাঁর বর্ণনায় কিয়া-মল-ক্কিয়া নামক স্থানের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিয়া-মল-ক্কিয়া থেকে পরবর্তী কমলাঙ্ক বা কুমিল্লার নামকরণ হয়েছে।

।। বরিশাল জেলা ।।

বরিশাল নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ প্রচলিত রয়েছে। এ সম্পর্কে বেশকিছু কিংবদন্তী শোনা যায়। এরকমই একটি কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে, পূর্বে এখানে নাকি অনেক বড়ো বড়ো শালগাছ জন্মাতো। এই বিশালাকৃতির শালগাছগুলোর কারণে এ অঞ্চলটিকে লোকে বড়শাল নামে ডাকতো বলে কথিত আছে। বড়শাল শব্দটি থেকেই পরে বরিশাল নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে অভিমত দেন অনেকে।

যদিও কেউ কেউ আবার দাবি করে থাকেন যে, বেরি ও শেলি নামক দুজন পর্তুগিজের প্রেমকাহিনি জড়িয়ে আছে বরিশাল নামকরণের সাথে। বেরিশেলি থেকেই কালের বিবর্তনে বরিশাল নামটি উদ্ভব। যদিও অন্য এক

কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, গিরদে বন্দরে (গ্রেট বন্দর) ঢাকা নবাবদের বড়ো বড়ো লবণের গোলা ও চৌকি ছিল। ইংরেজ ও পর্তুগিজ বণিকরা এই বড়ো বড়ো লবণের চৌকিকে 'বরিসল্ট' বলতো। আবার অনেকের ধারণা, এ অঞ্চলের লবণের দানাগুলো বড়ো বড়ো ছিল বলে ইংরেজ ও পর্তুগিজরা এই লবণকে 'বরিসল্ট' নামে সম্বোধন করতো। পরবর্তিতে বরিসল্ট শব্দটিই পরিবর্তিত হয়ে বরিশাল হিসাবে সর্বত্র পরিচিতি লাভ করে।

।। পটুয়াখালী জেলা ।।

পটুয়াখালী জেলার নামকরণ নিয়ে যে যে জনশ্রুতিটি প্রচলিত রয়েছে, সেটি হলো–বর্তমানে জেলা শহরের উত্তরদিক দিয়ে প্রবাহিত নদীটি একসময় পরিচিত ছিল ভরনী খাল নামে। কথিত আছে, এককালে এই খাল দিয়ে পর্তুগিজ জলদস্যুরা হানা দিতো এবং আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে খুন, লুণ্ঠনের মতো নিন্দনীয় কাজগুলো করতো।

এখানকার অধিবাসীরা বর্বর ভিনদেশী দস্যুদের নাম দিয়েছিল নটুয়া। যেহেতু ভরনী খাল দিয়েই নটুয়ারা আসতো এবং এই অঞ্চলে লুটতরাজ ও হত্যার মতো নৃশংস কাজগুলো চালাতো, সে কারণে পরবর্তীকালে ভরনী খালের নাম হয় নটুয়ার খাল। কিন্তু মানুষের মুখে মুখে এই নটুয়ার খাল পরিবর্তিত হয়ে একসময় পটুয়ার খাল হিসাবে পরিচিতি লাভ করে এবং আরো পরে গিয়ে পটুয়ার খাল পরিণত হয় পটুয়াখালীতে।

।। পিরোজপুর জেলা ।।

"ফিরোজ শাহের আমল থেকে ভাটির দেশের ফিরোজপুর,
বেনিয়া চক্রের ছোয়াচ লেগে পাল্টে হলো পিরোজপুর"

ওপরোক্ত কথন থেকে পিরোজপুর নামকরণের একটা সূত্র পাওয়া যায়। নাজিরপুর উপজেলার শাখারী কাঠির জনৈক হেলাল উদ্দীন মোঘল নিজেকে মোঘল বংশের শেষ বংশধর হিসেবে দাবি করেছিলেন বলে জানা যায়।

বাংলার সুবেদার শাহ সুজা সম্রাট আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলার নিকট পরাজিত হয়ে বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলে এসে আত্মগোপন

করেন। নলছিটি উপজেলার সুগন্ধা নদীর পাড়ে একটি কেল্লা তৈরি ক
কিছুকাল অবস্থান করেন। মীর জুমলার বাহিনী এখানেও হানা দেয়, শা
সুজা তাঁর দুই কন্যাসহ আরাকান রাজ্যে পালিয়ে যান। সেখানে তিনি অ
এক রাজার চক্রান্তে নিহত হোন।

কথিত আছে, পালিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী ও এক শিশুপুত্র রে
যান। পরবর্তীতে তারা অবস্থান পরিবর্তন করে ধীরে ধীরে পশ্চিমে চ
আসে। বর্তমান পিরোজপুরের পাশ্ববর্তী দামোদর নদীর মুখে আস্তানা তৈ
করেন। এ শিশুর নাম ছিল ফিরোজ। তাঁর নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম
ফিরোজপুর। কালের বিবর্তনে ফিরোজপুরের নাম হয় 'পিরোজপুর'।

।। রংপুর জেলা ।।

লোকমুখে প্রচলিত আছে, পূর্বে 'রঙ্গপুর' থেকেই কালক্রমে এই জেলাটি
নাম হয়েছে রংপুর। ইতিহাস বলে, ইউরোপে নীলের প্রচুর চাহিদা থাক
একসময় উপমহাদেশে ইংরেজরা নীলের চাষ শুরু করেছিল। এ
অঞ্চলটিকেও তারা নীল চাষের জন্য বেছে নিয়েছিল। আর এই অঞ্চলে
মাটিও ছিল বেশ উর্বর। এ কারণে এখানে তৎকালে প্রচুর নীলের চাষ হতে
সেই নীলকে এখানকার স্থানীয় লোকজন রঙ্গ নামে সম্বোধন করতো। কালে
বিবর্তনে সেই রঙ্গ থেকে একদিন এই অঞ্চল পরিচিতি পায় রঙ্গপুর নামে,
আজকের দিনে রংপুরে পরিণত হয়েছে। অপর একটি প্রচলিত ধারণা থেকে
জানা যায়, রংপুর জেলার পূর্বনাম ছিল রঙ্গপুর।

আবার কথিত আছে যে, প্রাগ জ্যোতিশ্বর নরের পুত্র ভগদত্তে
রঙ্গমহলের বেশ সুখ্যাতি ছিল। সেই রঙ্গমহল থেকে এই রঙ্গপুর নামটি আ
বলেও অনেকে অভিমত দিয়েছেন।

কোথাও কোথাও রংপুর জেলার পূর্বের নাম জঙ্গপুর হিসাবেও উল্লে
করা হয়েছে। ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব থাকায় এককালে কেউ কেউ এ
জেলাকে যমপুর বলেও ডাকতো। তবে রংপুর জেলা সুদুর অতীত থেকে
আন্দোলন-প্রতিরোধের মূল ঘাঁটি ছিল। তাই জঙ্গপুরকেও রংপুরের আদি না
হিসেবে ধরা হয়। উল্লেখ্য জঙ্গ অর্থ যুদ্ধ, পুর অর্থ নগর বা শহর।

।। সিলেট জেলা ।।

বহু সুপ্রাচীন গ্রন্থাদিতে বর্তমান সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন নামের উল্লেখ্য পাওয়া যায়, এসব নাম থেকেই কালের পরিক্রমায় আজকের 'সিলেট' নামটি উদ্ভব বলেও অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত।

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে, এ অঞ্চলে শিবের স্ত্রী সতী দেবীর কাটা হস্ত (হাত) পড়েছিল বলে কথিত আছে। এ কারণে এ অঞ্চলকে 'শ্রী হস্ত' নামে সম্বোধনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই 'শ্রী হস্ত' হতে 'শ্রীহট্ট' নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে হিন্দু সম্প্রদায় বিশ্বাস করে থাকে।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ঐতিহাসিক এরিয়ান লিখিত একটি বিবরণীতে এই অঞ্চলের নাম 'সিরিওট' বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া, খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকে এলিয়েনের বিবরণে 'সিরটে', এবং 'পেরিপ্লাস অব দ্য এরিথ্রিয়ান সী' নামক গ্রন্থে এ অঞ্চলের নাম 'সিরটে' এবং 'সিসটে' এই দুইভাবে নিবন্ধিত হওয়ারও উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর, ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে যখন চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এই অঞ্চল ভ্রমণ করেন, তিনি তাঁর ভ্রমণ কাহিনিতে এ অঞ্চলের নাম 'শিলিচতল' উল্লেখ করেছেন। তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী দ্বারা বঙ্গ বিজয়ের মধ্য দিয়ে এদেশে মুসলিম সমাজব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটলে মুসলিম শাসকগণ তাঁদের দলিলপত্রে 'শ্রীহট্ট' নামের পরিবর্তে 'সিলাহেট', 'সিলহেট' ইত্যাদি নাম লিখেছেন বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এভাবেই শ্রীহট্ট থেকে রূপান্তর হতে হতে একসময় সিলেট নামটি প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে বলে ঐতিহাসিকরা ধারণা করে থাকেন।

শুধু তাই নয়। বলা হয়, একসময় সিলেট জেলায় এক ধনী ব্যক্তির একটি কন্যা ছিল। তার নাম ছিল শিলা। কোনো কারণে তার কন্যাটি অকালে প্রাণ হারালে তিনি নিজের কন্যার স্মৃতি রক্ষার্থে একটি হাট নির্মাণ করেন, আর সেটির নামকরণ করেন 'শিলার হাট'। জনশ্রুতি রয়েছে, এই শিলার হাট নামটি সময়ের স্রোতে নানাভাবে বিকৃত হয়ে সিলেট নামের উৎপত্তি হয়।

।। গাইবান্ধা জেলা ।।

গাইবান্ধা জেলার নামকরণ নিয়ে প্রচলিত জনশ্রুতিটির মূল প্রোথিত অনেক অনেক কাল আগে। অর্থাৎ সেই মহাভারত যুগে। সময়টা আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছরেরও আগে। সে সময় এটি ছিল বিরাট রাজার রাজ্য। বলা হয়ে থাকে মৎস্য দেশের রাজা বিরাটের রাজধানী ছিল বর্তমান গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানা এলাকায়। মহাভারতে বলা হয়েছে শকুনির বুদ্ধিতে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনের কাছে পাণ্ডবরা পাশা খেলায় হেরে গিয়ে যখন নিজেদের রাজ্য হারালেন, তা ফিরে পাওয়ার শর্ত হিসাবে তাদেরকে প্রদান করা হলো বারো বছরের বনবাস এবং বনবাস পরবর্তী এক বছর অজ্ঞাতবাস। মহাভারতের সূত্রমতে, অজ্ঞাতবাসের এই এক বছর মৎস্য রাজ্যের রাজা বিরাটের রাজসভায় পঞ্চপাণ্ডব ও তাদের স্ত্রী দ্রৌপদী কাটিয়েছে।

বলা হয়ে থাকে মৎস্যরাজ্য রাজা বিরাটের সম্পত্তির মধ্যে গরুর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ হাজার। মাঝেমধ্যেই ডাকাতেরা হানা দিতো। লুটপাট চালাতো গোশালায়। এ সমস্যা প্রতিকারের লক্ষ্যে রাজা বিরাট একটি বিশাল পতিত প্রান্তরে গোশালা স্থাপন করলো। নবনির্মিত এই গোশালাটি ছিল পূর্বের চেয়ে আরো বেশি সুরক্ষিত। শুধু তাই নয় গাভীর খাদ্য ও পানির যোগান দিতে নদীতীর ঘেঁষা জায়গায় স্থাপন করা হয়েছিল। গোশালা নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে গেলে রাজার গাভীগুলো এখানেই বেঁধে রাখা হতো।

স্থানীয় ভাষায় গাভীকে গাই বলা হয়। আর বাঁধা শব্দটির এই অঞ্চলের কথ্যরূপ ছিল বান্ধা। জনশ্রুতি অনুসারে, গাভী বা গাই বেঁধে রাখা হতো বলে এই জায়গাটি একসময় স্থানীয়দের কাছে গাইবান্ধা নামে পরিচিতি লাভ করে।

।। নারায়ণগঞ্জ জেলা ।।

নারায়ণগঞ্জ জেলার নামকরণের সাথে যে মতবাদটি সবচেয়ে শক্তিশালী, সেটি হলো–১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পূর্ববঙ্গে বেশ উত্তাল সময়ের মধ্য দিয়ে পার করেছে। সেই উত্তাল সময়ে ভীখনলাল ঠাকুর নামে পূর্ববঙ্গেরই এক ব্যবসায়ী বহু ইংরেজের জীবন বাঁচিয়ে ছিল বলে জনশ্রুতি

রয়েছে। এই উপকারের পুরষ্কার হিসাবে ইংরেজরা তাকে একটি গঞ্জ দান করেন।

কথিত আছে, ভীখনলাল একবার স্বপ্নাদেশ পান পাঁচটি নারায়ণ মন্দির স্থাপনের। মন্দিরগুলো কোন কোন জায়গায় স্থাপন করতে হবে সেই নির্দেশও স্বপ্নের মধ্যে পেয়েছিলেন। স্বপ্নে পাওয়া আদেশ অনুযায়ী নারায়ণ মন্দির স্থাপনে নেমে পড়েন ভীখনলাল। একসময় মন্দিরগুলোর নির্মাণ কাজও শেষ হয়।

এই মন্দিরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছিল সেটি হলো দেওভোগের আখড়া, যা এখনো টিকে আছে। এই মন্দিরগুলো ছিল নারায়ণ মন্দির। তাই এই ইংরেজ কর্তৃক ভীখনলালকে যে গঞ্জ দান করা হয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে, সেটির নাম মন্দিরের আরাধ্য দেবতার নাম থেকেই হয়।

যদিও এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই।

।। লালমনিরহাট জেলা ।।

লালমনিরহাট বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি জেলা। এই জেলাটির নামকরণ নিয়ে তিনটি জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। এরমধ্যে একটি জনশ্রুতি এমন–ঊনবিংশ শতাব্দীতে এখানে বেঙ্গল ডুয়ার্স রেললাইন স্থাপনের কাজ চলছিল। ঐসময় রেললাইন স্থাপন কাজের প্রয়োজনে মাটি খনন করতে হয়েছিল। খনন কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকরা মাটির নিচে লাল রঙের পাথর দেখতে পায়। শ্রমিকরা লাল পাথরগুলোকে মণি সম্বোধন করে। লাল মণি পাওয়া গিয়েছিল বিধায় পরবর্তীতে এ জায়গাটি লোকমুখে লালমনি নামে পরিচিতি লাভ করে।

দ্বিতীয় যে জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীটি প্রচলিত রয়েছে, সেটি হলো–ব্রিটিশ রেলওয়ে এ অঞ্চলে রেললাইন স্থাপনের জন্য যে মহিলার জমি অধিগ্রহণ করেছিল, তার নাম লালমনি ছিল বলে অনেকেই ধারণা করে থাকেন। তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ এলাকার লোকজন এই জায়গাটিকে লালমনি নামে সম্বোধন করতে শুরু করে, যা কালের স্রোতে হারিয়ে না গিয়ে অক্ষয়রূপ ধারণ করে।

এই জেলার নামকরণ নিয়ে তৃতীয় জনশ্রুটি হলো–১৭৮৩ সালে সাধারণ কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লালমনি নামে এক মহিলা কৃষক

নেতা নুরুলদ্দিনকে সাথে নিয়ে ব্রিটিশ সৈন্য ও তাদের দেশীয় দোসর জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিল। সেই থেকে এ জায়গার নাম হয় লালমনি।

পরবর্তীকালে, লালমনির সাথে হাট যুক্ত হয়ে জায়গাটির নাম হয়ে যায় লালমনিরহাট।

।। বাগেরহাট জেলা ।।

সুন্দরবনে বাঘের বাস
দাড়টানা ভৈরব পাশ
সবুজ শ্যামলে ভরা
নদী বাঁকে বসতো যে হাট
তার নাম বাগের হাট।

পূর্বে বাগেরহাট জেলার নাম ছিল খলিফাতাবাদ; অর্থাৎ–প্রতিনিধির শহর। কথিত আছে, খানজাহান আলী (র.) গৌড়ের সুলতানদের প্রতিনিধি হিসেবে এ অঞ্চল শাসন করতেন। বাগেরহাট নামকরণ নিয়ে প্রচলিত রয়েছে বেশ কয়েকটি মতবাদ। কেউ কেউ মনে করে থাকেন যে, বরিশালের শাসক আগা বাকেরের নাম অনুসারে এই অঞ্চলের নাম বাগেরহাট হয়েছে। আবার কেউ বলেন, পাঠান জায়গীদার বাকির খাঁ'র নাম থেকে বাগেরহাট নামটির উৎপত্তি। অবশ্য কেউ কেউ আবার বলে থাকেন, এ অঞ্চলে একসময় বাঘের আধিক্য ছিল। সেখানে থেকে একে 'বাঘের হাট' বলা হতো। কালের পরিক্রমায় বাঘ শব্দটি বাগ শব্দে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের নাম বাগেরহাট হয়েছে বলেও অনেকে মত দিয়ে থাকেন। যদিও নামকরণ সম্পর্কে প্রচলিত রয়েছে আরো একটি জনশ্রুতি। বলা হয়, খানজাহান আলী (র.)–এর একটি বাগান ছিল। বাগান শব্দের ফার্সি শব্দ হলো বাগ। এই বাগ শব্দটি থেকেই বাগেরহাট এসেছে। করো মতে, এই অঞ্চলে নদীর বাঁকে হাট বসতো বিধায় নাম হয়েছিল বাঁকেরহাট। পরবর্তীকালে বাঁকেরহাট কথাটি মানুষের মুখে মুখে পরিবর্তিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বাগেরহাট হয়েছে।

।। টাঙ্গাইল জেলা ।।

টাঙ্গাইলের নামকরণ নিয়ে প্রচলিত রয়েছে বহু জনশ্রুতি। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রেনেলের মানচিত্রে সম্পূর্ণ অঞ্চলটাকেই আটিয়া নামে দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ না করলেই নয় যে, ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের আগে টাঙ্গাইল নামে কোনো স্বতন্ত্র স্থানের পরিচয় পাওয়া যায় না। টাঙ্গাইল নামটি পরিচিতি লাভ করে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে মহকুমা সদর দপ্তরটি আটিয়া থেকে টাঙ্গাইলে স্থানান্তর করার পর।

টাঙ্গাইলের ইতিহাস প্রণেতা খন্দকার আব্দুর রহিম সাহেবের মতে, ইংরেজ আমলে এ অঞ্চলের লোকেরা 'উঁচু' শব্দ পরিবর্তে 'টান' শব্দটি ব্যবহার করায় বেশি অভ্যস্ত ছিল। এখনো টাঙ্গাইল অঞ্চলে 'উঁচু' বোঝাতে 'টান' শব্দটি ব্যবহার করার প্রচলন রয়েছে। কথিত আছে, একসময় এ অঞ্চলে বিস্তির্ণ ফসলী জমি ছিল। এসব ফসলী জমির মাঝে ছিল উঁচু উঁচু আইল। জমির উঁচু আইলগুলোকে বলা হতো 'টান আইল'। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে সেই 'টান আইল' কথাটি পরিণত হয়েছে টাঙ্গাইলে।

টাঙ্গাইলের নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নজন বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন, ব্রিটিশ শাসনামলে মোগল প্রশাসন কেন্দ্র আটিয়াকে কেন্দ্র করে যখন এই অঞ্চলটি জমজমাট হয়ে উঠেছিল। সেই সময়ে ঘোড়ার গাড়ি ছিল যাতায়াতের একমাত্র বাহন, যাকে বর্তমান টাঙ্গাইলের স্থানীয় অধিবাসীরা বলতো 'টাঙ্গা'। বর্তমান শতকের মাঝামাঝি পর্যন্তও এ অঞ্চলের টাঙ্গা গাড়ির চলাচল ছিল। এ প্রসঙ্গে চলে আসে 'আল' শব্দটির কথা। বর্তমান টাঙ্গাইল অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের নামের সাথে এই আল শব্দটির যোগ লক্ষণীয়। এই আল শব্দটির অর্থ 'সীমা নির্দেশক', যেটির স্থানীয় উচ্চারণ আইল। একটি স্থানকে যে সীমানা দিয়ে বাঁধা হয় তাকেই আইল বলা হয়। টাঙ্গাওয়ালাদের বাসস্থানের সীমানাকে 'টাঙ্গাআইল' নামে সম্বোধন করা হতো, যেটি থেকে পরে 'টাঙ্গাইল' নামটি এসেছে বলে অনেকে মত পোষণ করে থাকেন।

গাজী, কালু ও চম্পাবতীর কিচ্ছা

গাজীর প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে এখন আর নিশ্চিত করে সেভাবে কিছু জানা না গেলেও, তাকে নিয়ে যে কয়টি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, সেগুলোর বরাত দিয়ে তার যে পরিচয়টি পাওয়া যায়, তা মোটামুটি এমন : বলা হয়ে থাকে, কিংবদন্তীর এই গাজী ছিলেন বিরাটনগরের শাসক দরবেশ শাহ্ সিকান্দরের প্রথমা স্ত্রী রানি অজুপা সুন্দরীর দ্বিতীয় পুত্র। তবে এই বিরাটনগরের সঠিক অবস্থান এখন আর জানা যায় না। যদিও ধারণা করা হয় নিকটবর্তী বৈরাটনগরটিই ছিল একসময়কার বিরাটনগর, যা কালের স্রোতে বৈরাটনগরে পরিণত হয়েছে। গাজীকে নিয়ে রচিত পুঁথি থেকে জানা যায়, রানি অজুপা সুন্দরীর গর্ভে শাহ্ সিকান্দরের দুটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছিল–গিয়াসউদ্দিন জুলহাস ও বরখান গাজী। এই বরখান গাজীই পরবর্তীতে গাজী পীর হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। তবে কোথাও কোথাও তাকে বড়ো খাঁ গাজী, গাজী সাহেব বা বড়ো গাজী নামেও সম্বোধন করতে দেখা গেছে।

এই দুই পুত্র ছাড়াও রাজারানির একটি পালকপুত্রও ছিল। সেই পালক পুত্রটির নাম ছিল কালু। শাহ্ সিকান্দরের দ্বিতীয় পুত্র বরখান গাজীর সাথে এই পালক পুত্রটির সখ্যতা গড়ে উঠছিল। গাজীকে অত্যন্ত ভালোবাসতো কালু। শুধু তাই নয়, সর্বত্র তাঁকে অনুসরণও করতো। সে ছিল গাজীর সবসময়ের সঙ্গী। গাজীর পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায় পূর্ববঙ্গে প্রচলিত একটি গীত থেকে :

পোড়া রাজা গয়েসদি, তা'র বেটা সমস্‌দি,
পুত্র তা'র সাই সেকেন্দর।
তার বেটা বরখান গাজী, খোদাবন্দ মুলুকের রাজী
কলিযুগে যার অবসর;
বাদসাই ছিঁড়িল বঙ্গে, কেবল ভাই কালু সঙ্গে
নিজ নামে হইলো ফকির।।

গীতটি থেকে গাজীর বংশের চার পুরুষের ধারণা পাওয়া, যেখানে গাজীর নাম বরখান গাজী বলে উল্লেখ রয়েছে। তার বাবা সাই সেকেন্দর আসলে দরবেশ শাহ্ সিকান্দর। আর শাহ্ সিকান্দরের পিতার নাম সমস্‌দি। এবং সমস্‌দির পিতা গয়েসদি।

কথিত আছে, শাহ্ সিকান্দরের জ্যেষ্ঠ পুত্র গিয়াসুদ্দিন জুলহাসের ছিল শিকারে প্রতি আলাদা টান। প্রায়শ তিনি শিকার করতে বের হতেন। তেমনি একবার শিকারের উদ্দেশ্যে বের হোন জুলহাস। সেই যে বের হলেন, এরপর আর কখনো ঘরে ফিরে আসেননি।

বলা হয়, জুলহাস নিরুদ্দেশ হওয়ায় রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণের জন্য চাপ আসতে থাকে যুবক গাজীর ওপর। কিন্তু রাজকার্যের প্রতি তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। বরং সে চায় ফকিরি গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে একজন ধর্মপ্রচারক হতে; সৃষ্টিকর্তার পথে নিজেকে সমর্পণ করতে। কিন্তু তাতে তার পিতা ঘোর অমত। বার বার পিতার কাছ থেকে রাজকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণের জন্য চাপ আসতে থাকলে প্রতিবারই গাজী তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে পিতার দূতকে ফেরত পাঠায়। সোজা কথায় কাজ না হলে এক পর্যায়ে বাঁকা পথ অবলম্বনের প্রয়োজন পড়ে। গাজীর ক্ষেত্রেও এমনটাই ঘটেছিল। তার ওপর নেমে আসতে থাকে একের পর এক অকথ্য নির্যাতন। প্রাণনাশের ভয়ও দেখানো হয়। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে গাজী অবিচল। রাজার আদেশে জল্লাদ তাকে হত্যা করার জন্য বধ্যভূমিতে নিয়েও গেল। কিন্তু দৈবক্রমে গাজীর কিছুই হলো না। জল্লাদের শাণ দেওয়া অস্ত্র গাজীর কোনো ক্ষতিই করতে পারলো না সৃষ্টিকর্তার অপার দয়ায়। কথিত আছে, তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, কিন্তু আগুনও যখন তাকে ছুঁতে পারলো না তখন বিশালাকার পাথরের সাথে বেঁধে নিক্ষেপ করা হলো সমুদ্রে। কিন্তু প্রতিবারই স্রষ্টার কৃপায় সে বেঁচে গেল। এও বলা হয়ে থাকে, একটি সূঁচের গায়ে বিশেষ চিহ্ন এঁকে দিয়ে সেটিকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করে গাজীকে আদেশ করা হলো গভীর সমুদ্র থেকে সূঁচটি তুলে আনবার জন্য। খোদার নিকট প্রার্থনা করলো গাজী।

তার প্রার্থনায় খোদার কৃপায় সাগর শুকিয়ে গেল। পাতালপুরী হতে উঠে এলো পানির নিচের জগতের শাসনকর্তা খোয়াজ খিজির। গাজীকে তার কাঙ্ক্ষিত সূঁচটি এনে দিলো পানির নিচের জগতের শাসনকর্তা। গাজী মহানন্দে রাজপ্রাসাদে প্রত্যর্পণ করলেন। এ ধরনের গল্পগুলো গাজীকে নিয়ে রচিত পুঁথি, পালা ও কিচ্ছাগুলোতে পাওয়া যায়।

এখানেই গাজীর গল্পটি শেষ নয়, বরং শুরু। পূর্বেই উল্লেখ করেছি গাজীকে নিয়ে আমাদের দেশে, বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অনেক অনেক জনশ্রুতি, লোককাহিনি বা কিংবদন্তীর প্রচলন রয়েছে। আর এগুলোতে বীর, আল্লাহ্‌র বন্ধু–পীর, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসাবেই দেখানো হয়েছে তাকে। শুধু তাই নয়, গল্পগুলোর কাহিনিতেও রয়েছে বৈচিত্রতা। প্রতিটা গল্পে এসেছে নতুন নতুন চরিত্র, ঘুরে গেছে কাহিনির বাঁক। কখনো বা যুক্ত হয়েছে নতুন কাহিনি।

গাজী-কালু হয়তো বা কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র, কিন্তু কালের স্রোতে তাদের প্রকৃত ইতিহাস আজ সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গেছে বলেই ধরে নিতে হবে। কিংবা এমনও হতে পারে, বাস্তবিকভাবে এদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না, সবটাই মানুষের কল্পনার ফসল। তাই আরো একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এই বইয়ে গাজীকে নিয়ে যে গল্পগুলো তুলে ধরছি সেগুলোর ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, বরং মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনি মাত্র, যা থেকে কখনো কখনো বিভিন্ন কবি রচনা করেছেন গান, পুঁথি, পালা।

যাই হোক, গাজীর গল্পে ফিরে যাওয়া যাক। বলা হয়ে থাকে, মনের মধ্যে গাজী যে বাসনাটি তখনো লালন করে চলেছে, একটা সময় সেটি এতটাই তীব্র হয়ে উঠলো যে কাউকে কিছু না বলে এক রাতে নিজের সবসময়ের সঙ্গী কালুকে নিয়ে গোপনে রাজগৃহ ত্যাগ করলো। ধারণ করলো ফকিরের বেশ। রাজবাড়ি ছেড়ে তারা দুজনে গিয়ে উপস্থিত হলো বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলে। সেখানে কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে অর্জন করলো আধ্যাত্মিক শক্তি। কথিত আছে, সেই সময় ঐ অঞ্চলে তখন বাঘেদের উৎপাতে জনজীবন ভয়াবহ রকমের বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল। বাঘের কবলে পড়ে প্রাণ হারাচ্ছিল এখানকার অনেক অধিবাসী। গাজী ও কালুর আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলের প্রভাবে শেষ পর্যন্ত ঐ অঞ্চলের বাঘেরা বশীভূত হতে বাধ্য হলো। মানুষের জীবনে শান্তি ফিরে এসেছিল। এজন্য এ অঞ্চলে আজও গাজী-কালু বেশ প্রভাবশালী পীর। বাঘকে কেন্দ্র করে গাজী-কালুর ঘটনাটির ভিন্ন ধরনের বর্ণনাও পাওয়া যায় কোথাও কোথাও। সেই গল্পের সাথে জড়িয়ে আছে আরেক কিংবদন্তী।

সুন্দরবন অঞ্চলে আরেকটি কথা বেশ প্রচলিত। বলা হয়ে থাকে, গাজী নাকি বাঘের পিঠে চড়ে বনের ভেতরে ঘুরে বেড়াতেন।

বলা হয়, সুন্দরবন অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে দুইভাই সেখান থেকে উপস্থিত হলেন ছাপাইনগরে। তৎকালে সেখানকার রাজা ছিলেন রাজা শ্রীরাম। তারা দুজনে সোজা রাজার প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে রাজা ভীষণ ক্রোধান্বিত হোন এবং তাদের দুজনকে অপমান করে নিজ রাজ্যের বাইরে বের করে দেন।

গাজী-কালুকে রাজ্য থেকে বের করে দেওয়ার পর অকস্মাৎ রাজবাড়িতে আগুন লাগে। সেই আগুন নিভাতে পারে সে সাধ্য কার। শুধু কী তাই, অপহৃত হলো ছাপাইনগরের রানি। কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না তাকে। যেন অকস্মাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন। রাজা ভেবে কোনো কূলকিনারা করতে পারলেন না। এদিকে সবাই বলাবলি করতে শুরু করলো যে, এসব নাকি গাজী-কালুরই কেরামতি। তাদের সাথে রাজার করা খারাপ আচরণের ফল। তারা ব্যতীত আর কেউই পারবে না এই ঘোর বিপদে রাজাকে সহায়তা করতে। তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই রাজা তাদের শরণাপন্ন হলেন। কালবিলম্ব না করে তাদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন শ্রীরাম রাজা। এবং খুব দ্রুত সন্ধান পেয়েও গেলেন। নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলেন তাদের কাছে। পুঁথির ভাষায় এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

কহেন শ্রীরাম রাজা
জোড় করি কর–
আগুন জ্বলিয়া পুরি হৈয়া গেল ছাঁই,
কোথায় গেলেন রানি, খুঁজিয়া না পাই।

গাজী-কালু রাজাকে ক্ষমা করে দিলেন। আর তখনই ঘটল অদ্ভুত কাণ্ড। তৎক্ষণাৎ রাজবাড়ির প্রলয়ংকারী আগুন নিভে গেল। রানিকেও দেখা গেল। গাজী-কালুর কেরামতি দেখে বিস্মিত হলেন রাজা। তাদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেল রাজা। পরবর্তীতে ছাপাইনগরে নির্মিত হয়েছিল একটি সুরম্য মসজিদ।

এরপর ছাপাইনগর থেকে দুই ভাই গেল ব্রাহ্মণনগরে। সেখানকার শাসক রাজা মুকুট রায় ছিলেন ভীষণ গোড়া এবং মুসলমান বিদ্বেষী। রাজার ছিল সাত পুত্র ও এক কন্যা। রাজকন্যা চম্পাবতী ছিল ভীষণ সুন্দরী। কথিত আছে, আমাদের দেশে বহুলপ্রচলিত ও জনপ্রিয় 'সাতভাই চম্পা'

উপাখ্যানটির উৎপত্তি এখান থেকে।

যাই হোক, চম্পাবতীর রূপের সাথে তুলনা করা যায় এমন দ্বিতীয় কেউ ঐ সময় ছিল না। চম্পাবতীকে দেখা মাত্রই তার রূপে মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না গাজী। চম্পাবতীও মুগ্ধ হলো গাজীকে দেখে। দুজনে প্রেমে পড়ে গেল একে অপরের। ভুলে গেল নিজেদের ধর্মের মধ্যকার পার্থক্যের কথা। কিন্তু তাদের প্রেমের মাঝে ঠিকই প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল সামাজিক ও ধর্মীয় বাধাগুলো। কালুকে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে রাজদরবারে প্রেরণ করলে রাজা ভীষণ ক্রুদ্ধ হোন এবং তাকে বন্দী ও কারাগারে নিক্ষেপ করে। মুকুট রাজার এমন আচরণে গাজীও তার ওপর ভীষণ ক্রোধান্বিত হোন। মুকুট রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। রাজাও গাজীকে মোকাবিলা করার জন্য তার সেনাপতি দক্ষিণ রায়কে প্রেরণ করেন। গাজীর সাথে ভীষণ যুদ্ধ হয় দক্ষিণ রায়ের। কথিত আছে, সেই যুদ্ধে গাজীর কাছে দক্ষিণ রায় পরাজিত হলে গাজী তাকে বন্দী করেন এবং তার একটি কান ও বারো হাত লম্বা টিকিটি কেটে নেন। এই সংবাদ শুনে ঘোর অপমানিতবোধ করেন মুকুট রাজা। তিনি নিজে কয়েক হাজার সৈন্য সমেত গাজীকে আক্রমণ করে বসেন।

কথিত আছে, এ যুদ্ধে গাজীর পক্ষে সুন্দরবনের বাঘ ও পরীরা লড়াই করেছিল। যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মুকুট রাজা পরাজিত হোন এবং গাজীর সাথে তার মেয়ে চম্পাবতীকে বিয়ে দেন। গাজীকে কেন্দ্র করে রচিত পুঁথির মূল বিষয় মূলত গাজী ও চম্পাবতীর প্রেমের আখ্যান।

গাজী, কালু ও চম্পাবতীর গল্পটি আরেকভাবেও প্রচলিত। বলা হয়, কালুকে সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্মণনগরে ভ্রমণে এসে মুকুট রাজার কন্যা চম্পাবতীর সাথে দেখা হয় গাজীর। এরপর দুজনের মধ্যে প্রেম হয়। কিন্তু তাদের দুজনের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সমাজ ও ধর্ম। রাজার কানে তাদের দুজনের মধ্যকার প্রেমের কথাটি পৌঁছলে নিজের সম্মান রক্ষার্থে তিনি তার সেনাপতি দক্ষিণ রায়কে পাঠান গাজী ও কালুকে শায়েস্তা করার জন্য। গাজী ও দক্ষিণ রায়ের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বাঁধে। কেউ কারো থেকে কম যান না। এক পর্যায়ে গাজীর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয় মুকুট রাজার সেনাপতি দক্ষিণ রায়। কিন্তু গাজী তাকে বন্দী না করে মুক্ত করে দেন। গাজীর এই মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হোন সেনাপতি দক্ষিণ রায়। সেই সাথে আমৃত্যু গাজীর পক্ষ অবলম্বনের প্রতিশ্রুতিও প্রদান করেন। গাজী, কালু ও চম্পাবতীর মাজারের পাশে আরো একটি কবর দেখা যায়। বলে হয়ে থাকে, এই কবরটি নাকি দক্ষিণ রায়ের কবর।

রাজা মুকুট রায় ছিলেন ঝিনাইদহ, কোটচাঁদপুর, বারোবাজারের পূর্ব

এলাকা ও বেনাপোল অঞ্চলের সামন্ত রাজা। সেই সময় তার রাজ্যের সীমানা ছিল বেশ বিস্তৃত। অন্যত্র তাকে রামচন্দ্র, শ্রীরাম বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। রাজার ছিল মোট চারটি বাড়ি–ঝিনাইদহের বাড়িবাথান, বারোবাজারের ছাপাইনগর (বর্তমানে বাদুরগাছা), কোটচাঁদপুরের জয়দিয়া বাওড়ের বলরামনগর, বেনাপোলের কাগজপুরে। মুকুট রাজা বা রাজা রামচন্দ্রের সাথে গাজীর বাহিনীর ভীষণ যুদ্ধ হলে সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজা নিজ কন্যা চম্পাবতীকে সঙ্গে নিয়ে তার প্রধান বাড়ি ঝিনাইদহের বাড়িবাথানে চলে আসেন। তাকে অনুসরণ করে গাজীও সেখানে হাজির হোন। ঝিনাইদহে গিয়ে গাজী, রাজার সেনাপতি গয়েশ রায়ের প্রমোদ ভবন জালিবলস্না পুকুরের পাড়ে বদমতলীতে ছাউনি ফেলেন বলে কথিত আছে। তাই পরবর্তীতে এই জায়গাটিতেও গাজীর মাজারপার গড়ে ওঠে, যা এখনো রয়েছে। শুধু এই জায়গাতেই নয়, দেশের বিভিন্ন জায়গাতে গাজীর মাজারপার, দরগা চোখে পড়ে।

যা হোক, রাজার পিছু পিছু গাজী ঝিনাইদহে পৌঁছলে, সেখান থেকে সে তার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে চলে যান জয়দিয়া বাওড়ের বাড়িতে। এ বাড়ির অবস্থান দেখলে মনে হয়, রাজা অত্যন্ত শৌখিন ছিলেন। জয়দিয়ার বাওড় একসময় ভৈরব নদের অংশ ছিল। বাওড়ের পূর্বপাড়েই ছিল রাজার বাড়িটি। বাড়ি থেকে দুই কিলোমিটার পূর্বে বলহর বাওড় অবস্থিত, যেটি একসময় কপোতাক্ষ নদেরই একটি অংশ ছিল। দুই বাওড় তথা দুই নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত এই রাজবাড়ির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। দক্ষিণপাশে বাওড়ের তীর ঘেষে যে তমাল গাছটি রয়েছে, সেটির নিচে এখনো গাজীর দরগা বিদ্যমান। কে জানে, হয়তো প্রেমের টানে গাজী এখানেও ছুটে এসেছিলেন তার সবসময়ের সঙ্গী কালু ও দক্ষিণ রায়কে নিয়ে। তার স্মৃতি ধরে রাখতেই হয়তো পরবর্তীতে গড়ে তোলা হয়েছে এই দরগাটি।

গাজী অনুসারীদের সাথে মুকুট রাজার বেশ কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। শেষ পর্যন্ত মুকুট রাজার গাজীর বাহিনীর কাছে পরাজয় মেনে নিতে হয়েছিল। শোনা যায়, রাজার কাছ থেকে চম্পাবতীকে উদ্ধার করে বারোবাজার ফিরে এসেছিলেন গাজী। কিন্তু গাজীর পিতা শাহ্ সিকান্দর বিষয়টা মেনে নেননি। কারণ মুকুটি রাজা শাহ্ সিকান্দারের প্রতিবেশী ছিলেন। হিন্দু সমাজের অসন্তুষ্টির কারণে তিনি গাজীকে রাজবাড়িতে উঠতে দেননি। বিরাটনগরে তার আর ফেরা হয় না। বাধ্য হয়ে গাজী দরবেশ বেশ ধারণ করে চম্পাবতীকে নিয়ে বাদাবনে বেরিয়ে পড়ে। তাদের হয় সঙ্গী হয় কালু ও দক্ষিণ রায়। সুন্দরবনের বাদাবন বেশি

দূরে ছিল না। স্ত্রী চম্পাবতী, সবসময়ের সঙ্গী কালু ও দক্ষিণ রায়কে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হোন। গড়ে তুলেন আস্তানা গাজী। শুরু করেন কঠোর সাধনা। আর এভাবেই হয়ে ওঠেন দরবেশ গাজী।

ইতোপূর্বের গল্পটি রাজবাড়ি থেকে পালিয়ে গাজী ও কালু সুন্দরবন অঞ্চলে যাওয়ার বর্ণনা ছিল, যেখানে গিয়ে তারা কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে। কিন্তু এখানে এসে গল্পটিতে যুক্ত হয়েছে একেবারে ভিন্ন কাহিনি। এখানে উল্লেখ পাওয়া যায়, চম্পাবতীকে উদ্ধারের পর পিতা শাহ্ সিকান্দর কর্তৃক রাজমহল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে সুন্দরবন অঞ্চলে চলে যান এবং সাধনার মধ্য দিয়ে অর্জন করেন আধ্যাত্মিক ক্ষমতা। হয়ে ওঠেন লৌকিক পীর।

দক্ষিণ রায় ও গাজীর মধ্যকার বন্ধুত্ব হওয়া নিয়েও ভিন্ন একটি কাহিনির উল্লেখ পাওয়া যায়। গাজীকে নিয়ে সুন্দরবন কেন্দ্রিক যে কিংবদন্তীটি রয়েছে সেটির সাথে এই কাহিনিটি সম্পৃক্ত। শুধু তাই নয়, এর সাথে জুড়ে আছে বনবিবিকে নিয়ে প্রচলিত কিংবদন্তীটিও, যে কিনা বাংলার লৌকিক পীরানিদের একজন। উল্লেখ্য, সেখানে দক্ষিণ রায়কে রাজার সেনাপতি নয়, বরং মুকুট রাজা হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কাহিনির ধারাটিও ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে। সেই ঘটনাটির বিস্তারিত বর্ণনা বনবিবি ও দক্ষিণ রায়ের কাহিনিতে তুলে ধরা হয়েছে। দক্ষিণ রায়ের সাথে গাজীর বন্ধুত্ব হওয়ার পেছনের ঘটনাটি যা-ই হোক না কেন, কালুর মতো গাজীর যে আরো একজন সঙ্গী ছিলেন, যার নাম দক্ষিণ রায়, সেই উল্লেখ অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়।

যাই হোক, পরবর্তী সময়ে গাজী, কালু, চম্পাবতী ও দক্ষিণ রায় পুনরায় বারোবাজারে ফিরে এসেছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এখানেই কাটিয়েছেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। গাজী কালু ও চম্পাবতীর মাজারে হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের মানুষের যাতায়াত রয়েছে। তারা সেখানে মানত করে। শ্রীরাম রাজার বেড় দিঘির দক্ষিণ পাশে ৩টি পাশাপাশি কবরের অবস্থান। মাঝখানে বড়ো কবরটি গাজীর, পশ্চিমেরটি কালুর এবং পূর্বের ছোটো কবরটি চম্পবতীর কবর বলে পরিচিত। মাজার সন্নিহিত দক্ষিণপশ্চিম দিকে একটি প্রাচীন বটগাছ আছে।

একসময় ফকিরেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে গাজীর শিন্নির জন্য চাল সংগ্রহ করতো। তখন তারা গাজীর শানে প্রচুর গান শোনাত। তাতে থাকতো গাজী, কালু ও চম্পাবতীর গল্প। বর্ণিত হতো গাজীর কেরামতির কাহিনি। আজও হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সব ধর্মালম্বীদেরই এই মাজারে যাতায়াত রয়েছে।

শিন্নি দেওয়া হলে ভক্তদের প্রায়শ সুর করে করে বলতে শোনা যায় :

গাজী মিয়াঁর হাজোতে
সিন্নি পূরণ হলো।
হিন্দুগণে বলো হরি
মোমিনে আল্লা বলো।।

সুন্দরবন অঞ্চলের মৎস্যজীবী, মৌয়াল, কাঠুরে, নৌকার মাঝিরা আজও বিপদে গাজীকে স্মরণ করে। তার নামে শিন্নি করে। তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে সুর করে গীত গাইতে থাকে :

আমরা আজি পোলাপান।
গাজী আছে নিখাবান,
শিরে গঙ্গা দরিয়া,
পাঁচ পীর বদর বদর।

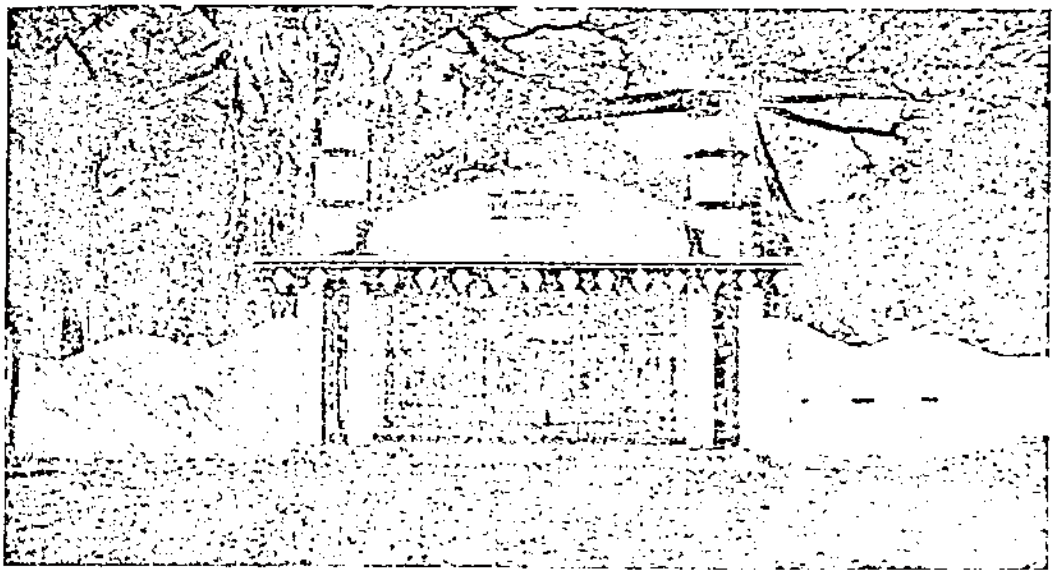

ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত বারোবাজারের পূর্বদিক বরাবর এক কিলোমিটার দূরে একসাথে তিনটি মাজার অবস্থিত। মতবিরোধ থাকলেও এটিই গাজী, কালু ও চম্পাবতীর মাজার হিসাবে স্থানীয়দের কাছে স্বীকৃত। ব্যাঘ্রশঙ্কুল দক্ষিণবঙ্গে গাজী পীরের প্রভাব বিস্তার ও মাহাত্ম্য নিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে অনেক কিংবদন্তী, যা ঐ অঞ্চলের মানুষ আজও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। শুধু দক্ষিণাঞ্চল নয়, গাজী, কালু ও চম্পাবতীর উপাখ্যানটি

ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র বাংলাদেশজুড়ে। ঐতিহাসিক এই ব্যক্তিত্বকে নিয়ে এত এত কিংবদন্তী প্রচলিত যে, তার সম্পর্কে এখন আর সঠিকভাবে বিশেষ কিছু আর জানা যায় না। তবে অনেকেই এটা স্বীকার করে নিয়ে থাকেন যে এই অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে গাজী নামধারী ব্যক্তিটির অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু গাজীর প্রকৃত ইতিহাসটি আজ ঢাকা পড়ে গেছে লোক মুখে প্রচলিত গল্পের আড়ালে।

গাজীকে নিয়ে বেশকিছু পুঁথি রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : *গাজী মঙ্গল*, *বড়খাঁ গাজীর কেরামতি*, *গাজী কালু ও চম্পাবতী পুঁথি*, *দরাফ খাঁ গাজী*।

জঙ্গলের রক্ষাকর্ত্রী পীরানি বনবিবি

বনবিবি বা বনদেবী একইসাথে হিন্দুধর্মের দেবী ও কিছু কিছু অরণ্যবাসী মুসলমানের পীরানি। তিনি বনদূর্গার অন্যরূপ বলেও স্বীকৃত। সাধারণত সুন্দরবন অঞ্চলের লোকায়ত দেবী হিসাবে বনবিবি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছে পূজিত হয়ে আসছেন যুগের পর যুগ ধরে। সুন্দরবনের মধু সংগ্রাহক, মৎস্যজীবী ও কাঠুরে জনগোষ্ঠী বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে বনবিবির পূজা বা সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে। এ অঞ্চলের নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের জঙ্গলের রক্ষাকর্ত্রী দেবী বনবিবিকে ঘিরে মানুষের মুখে বেশকিছু উপকথা প্রচলিত রয়েছে।

বনবিবির বাবা বেরাহিম আরবদেশ থেকে এদেশে এসেছিলেন বলে বিশ্বাস করে তার ভক্তেরা। বেরাহিমের পরিচয় দিতে গিয়ে কেউ কেউ তাকে আরব সওদাগর বলে উল্লেখ করেন, কেউ আবার ধর্মপ্রচারক ফকির বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। বেরাহিমের প্রথমা স্ত্রী ফুলবিবি ছিল বন্ধ্যা। সে তাকে সন্তান দিতে ব্যর্থ হয়। এতে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার মনঃস্থির করে বেরাহিম। কিন্তু চাইলেই সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারে না; এজন্য প্রথম স্ত্রীর অনুমতির প্রয়োজন। প্রথম স্ত্রীর অনুমতি থাকলেই কেবল দ্বিতীয়বার বিয়ে করা সম্ভব। বেরাহিম প্রথম স্ত্রীর কাছে অনুমতি চাইলে তার স্ত্রী তাকে একটি ইচ্ছা পূরণের প্রতিশ্রুতি দানের বিনিময়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার অনুমতি প্রদান করে।

যা হোক, প্রথমা স্ত্রীর অনুমতি পেয়ে গুলালবিবি নাম্নী এক সুলক্ষণা ও সুন্দরী মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোন বেরাহিম।

একসময় সন্তানসম্ভবা হোন গুলালবিবি। আর ঐ সময় সৃষ্টিকর্তাও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে স্বর্গ থেকে বনবিবি ও শাহ জঙ্গলিকে পৃথিবীতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। এদিকে বেরাহিমের প্রথমা স্ত্রী ফুলবিবি স্বামীকে তার একটি ইচ্ছা পূরণ করার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে আবদার করে গর্ভবতী গুলালবিবিকে কোনো এক বনভূমিতে ছেড়ে আসতে। প্রথমে রাজী হোন না বেরাহিম। কিন্তু শেষমেশ তাকে বাধ্য হতে হয় এমন নিষ্ঠুর কাজ করা জন্য। বেরাহিম তার দ্বিতীয় স্ত্রী গুলালবিবিকে জঙ্গলে তথা সুন্দরবনে ফেলে আসে।

জঙ্গলে যমজ পুত্র-কন্যার জন্ম দিয়ে মারা যায় গুলালবিবি। এভাবেই জন্ম হয় বনবিবি ও তার ভাই শাহ জঙ্গলির। সদ্যজাত শিশু দুটির কান্নার শব্দে জঙ্গলের বাঘ, কুমির, হরিণ, অজগর সবাই ছুটে আসে। বনের পশুগুলোই মাতৃহারা সন্তান দুটিকে লালনপালন করতে থাকে। বড়ো হয়ে এই ছেলেটি হয় বাঘের রাজা এবং মেয়েটি হয় বনবিবি।

যদিও সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে গুলালবিবির মৃত্যুর বিষয়টি কেউ কেউ অস্বীকার করে। তারা বলে, প্রথমা স্ত্রীর আবদার পূরণ করতে বেরাহিম আরবদেশ থেকে সুন্দরবনে আসেন এবং দ্বিতীয় স্ত্রী গুলালবিবিকে রেখে আবার সেখানে ফিরে যান। গুলালবিবি জঙ্গলেই দুই সন্তানের জন্ম দেন। ধীরে ধীরে তারা বেড়ে উঠতে থাকে। একসময় ফুলবিবি তার ভুল বুঝতে পারে এবং স্বামী বেরাহিমকে বলে গুলালবিবিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। প্রথমা স্ত্রীর কথা মতো বেরাহিম আবার সুন্দরবনে ফিরে আসে। গুলালবিবি ও সন্তানদেরকে সাথে নিয়ে আরবে ফিরে যান। তারা মক্কায় বসবাস শুরু করেন। একদিন শাহ জঙ্গলি ও বনবিবি মসজিদে প্রার্থনা করার সময় দুটো জাদুর টুপি পায়। ঐ টুপি দুটির সাহায্যেই তারা ভারতবর্ষের আঠারো জোয়ারের দেশে চলে আসে।

অন্যত্র পাওয়া যায়, পিতা বেরাহিম যখন বনবিবি ও তার ভাই শাহ জঙ্গলিকে ফিরিয়ে নিতে আসেন, তখন বনবিবি পিতার সাথে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানান। এদিকে ভাই-বোনের একে অপরের প্রতি ছিল অগাধ ভালোবাসা। তাই বোনের সিদ্ধান্তকেই মেনে নিয়ে শাহ জঙ্গলি নিজেও থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বনবিবি যখন সুন্দরবনে আসেন, তখন অঞ্চলের শাসক ছিল রাজা দক্ষিণ রায়। সে ছিল যশোরের ব্রাহ্মণনগরের রাজা মুকুট রায়ের অধীন ভাটি

দেশের রাজা। বলা হয়ে থাকে, রাজা দক্ষিণ রায় বাঘের রূপ ধারণ করতে পারত এবং প্রায়ই বাঘের রূপ ধারণ করে নিরীহ মানুষের ওপর আক্রমণ করতো। অনেকটা ইউরোপে প্রচলিত ওয়ার উলফ্ ধারণাটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও একে মোটেও সেই ধারণা থেকে গৃহীত বলা যাবে না। কারণ এসব লোককাহিনি সমাজের নিচু শ্রেণির মানুষগুলোর মধ্যে সৃষ্ট। দক্ষিণ রায়কে দানব রাজা বলেও কোথাও কোথাও সম্বোধন করা হয়েছে। বনবিবির সাথে দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে দক্ষিণ রায় তথা অপশক্তির পরাজয় হয়। এভাবেই দক্ষিণ রায়ের হাত থেকে বনবিবি নিরীহ প্রজাদের বাঁচান।

গল্পটির ভিন্নরূপও পাওয়া যায়। মুন্সি বয়নদ্দি রচিত *বোনবিবি জহুরনামা* থেকে জানা যায়, আরবদেশ থেকে এসে বনবিবি ও শাহ জঙ্গলি সুন্দরবন অঞ্চলের বাদাবনে আস্তানা স্থাপন করেন। সেখানে তাদের সাথে দেখা হয় পীর ভাঙ্গড়ের সাথে। পীর ভাঙ্গড় তাদের আগনের উদ্দেশ্য জানতে পেরে বললেন :

এখানে দক্ষিণ রায় ভাটির ঈশ্বর।
নানা শিষ্য কৈল সেই বনের ভেতর-
নুন, মধু, খাড়ি, জড়ি, বহুত এরছাই।
হাট মধু বসায়েছে কত ঠাইঠাই।
পহেলা যাইয়স তুড়ে ডাল এ সকল।
তবে মাগো ভাটি দেশ হইবে দখল।

যা হোক, তাদের আগমনের খবর রাজা দক্ষিণ রায়ের কানে পৌঁছলে সে তার বন্ধু সনাতন রায়কে পাঠান তাদের সম্পর্কে খোঁজ নিতে। সনাতন রায়ের কাছ থেকে তাদের দুজন সম্পর্কে জানার পর দক্ষিণ রায় তাদেরকে নিজের রাজ্য থেকে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। রাজা বুঝতে পেরেছিলেন এমনি এমনি তাদেরকে তাড়াতে পারবে না। তাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয় সে। রাজার সৈন্যদের সাথে ঘোরতর যুদ্ধ হয় বনবিবির। কিন্তু সেই যুদ্ধে পেরে উঠতে পারে না রাজা। বনবিবি ও তার ভাই শাহ জঙ্গলির কাছে পরাজিত ও বন্দী হয় সে। তখন রাজার মা নারায়ণী নিজেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ভূতপ্রেতের সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে যান।

দীর্ঘদিন ধরে বনবিবি ও শাহ জঙ্গলির সাথে রাজার মায়ের ভূতপ্রেত বাহিনীর যুদ্ধ চলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বনবিবির কাছে পরাজিত হয় নারায়ণীর ভূতপ্রেত বাহিনী। করুণাময়ী বনবিবি নারায়ণীকে তার পুত্র এবং পূর্ববর্তী

রাজ্যের অর্ধেক ফিরিয়ে দেন। এভাবেই নারায়ণী ও বনবিবির মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

অবশ্য পুঁথিতে আছে, রাজা দক্ষিণ রায় যুদ্ধে অগ্রসর হলে তার মা নারায়ণী তাকে বাধা দেন। নারায়ণী তার ছেলেকে বলে :

আওরাতে আওরাতে যুদ্ধ
করাই হলো বিধেয়।

নারায়ণী রণসাজে সজ্জিত হয়ে উপস্থিত হলো রণাঙ্গনে, উপস্থিত হলো বনবিবির সম্মুখে। দুজনের মধ্যে যুদ্ধ ঘোরতর যুদ্ধ। নারায়ণী আক্রমণ করে বনবিবিকে। পুঁথিতে সেই আক্রমণের বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে :

খঞ্জর লইয়া হাতে
নেমে আইসে রথ হতে
মারে জোরে বিবির ওপর।
না লাগে বিবির গায়,
ফুল হয়ে উড়ে যায়,
ফাতেমার দোয়ার গুণেতে।।

পাল্টা আক্রমণ করে বনবিবি।

বনবিবি হুঙ্কারিয়া
চারিদিকে বেড়া দিয়া,
ঘেরে সবে এজামের জালে
খুন্তি আশা ছিল হাতে,
ফুঁক দিয়া ছাড়ে তাতে,
ছেড়ে দিলো আশমানের পানে।

মা ফাতেমার দোয়ায় বনবিবির বিজয় সুনিশ্চিত দেখে নারায়ণী তাকে সই বলে সম্বোধন করে। তার সম্বোধনে যুদ্ধ থামালেন বনবিবি। শুধু তাই নয়, এই সম্বোধনের খাতিরে তিনি সুন্দরবনের কিছু অংশ দখল করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন এবং ঐ অঞ্চলগুলোর শাসনকর্তা হিসাবে দক্ষিণ রায় বহাল থাকবেন বলে ঘোষণা দেন।

সুন্দরবনের বাসিন্দারা সুন্দরবনকে বনবিবির রাজ্যরূপে বিশ্বাস করলেও দক্ষিণ রায়কে মনে করে গভীর জঙ্গলের শাসক।

এ অঞ্চলে বনবিবির পুজোর প্রবর্তন ও আঠারো ভাটিতে তার আধিপত্য বিস্তার নিয়ে আরো একটি কিংবদন্তীর প্রচলন রয়েছে। কথিত আছে, বারিজহতি গ্রামের দুই ভাই বসবাস করতো। ধোনা ও মোনা। পেশায় তারা ছিল মৌয়াল। গভীর জঙ্গল থেকে মোম ও মধু সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতো তারা। একবার মোম ও মধু সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জঙ্গলে অভিযান চালায় তারা। ঐ সময় তাদের সঙ্গী হয় গ্রাম সম্পর্কিত ভাইপো দুখে। পিতৃহারা দুখে অভাবে পড়ে অতি অল্পবয়সে ভয়াবহ অরণ্যে যায়। এদিকে দক্ষিণ রায়ের পুজো করতে ভুলে যায় ধোনা। দুই ভাই প্রথম কয়েক দিন মোম ও মধু দুটোর কোনোটাই সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়। জঙ্গলের মধ্যে এভাবেই দিন কাটাতে থাকে তারা। কিন্তু কোনো ফল হয় না।

একদিন দক্ষিণ রায়কে স্বপ্ন দেখে ধোনা। নিজের পরিচয় দিয়ে স্বপ্নের মধ্যে বলে :

দণ্ড রক্ষ মুনি ছিল ভাটির প্রধান।
দক্ষিণ রায় নাম–আমি তাহার সন্তান।।

অর্থাৎ, দক্ষিণ রায়ের বাবার নাম ছিল রক্ষ মুনি, যিনি একসময় ভাটির প্রধান ছিল।

তার পুজো দিতে ভুলে যাওয়ায় ধোনার কাছে দক্ষিণ রায় বলী দাবী করে। বিনিময়ে অনেক মধু ও মোম প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। নইলে মোম-মধু দুটোর কোনোটাই পাওয়া যাবে না। ধোনা প্রথমে রাজী হয় না। দ্বিতীয় দিন আবারও একই স্বপ্ন দেখে সে। এবার ধোনার মন কিছুটা নরম হয়। কিন্তু তাও দক্ষিণ রায়ের চাওয়া পূরণ করে না। একইভাবে তৃতীয় দিনেও একই স্বপ্ন দেখে। এবার লোভী ধোনা নিজের লোভকে আর সংবরণ করতে পারে না। মধু ও মোমের বিনিময়ে বলী দানে রাজী হয় সে। তার আশা পূরণ হয়। প্রচুর পরিমাণে মধু ও মোম সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় তারা। ফিরে আসার সময় দক্ষিণ রায়ের ভোগের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দুখেকে। তারা তাকে গভীর জঙ্গলে দুখেকে ফেলে রেখেই গ্রামে ফিরে আসে।

এদিকে মধু সংগ্রহের জন্য জঙ্গলে আসার আগে দুখের মা তাকে বলে দিয়েছিল, জঙ্গলে কোনো বিপদে পড়লে সে যেন বনবিবির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। গভীর জঙ্গলে একা দুখে যখন মানুষ খেকো বাঘের সামনে

পড়ে, তখন মায়ের বলে দেওয়া উপদেশ মতো বনবিবির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।

বিষম দুরন্ত বাঘ আসে গাল মেলে।
দুখে দেখে মা বলিয়ে গিয়ে ভূমিতলে।
এইরূপে মা বলে ডাকে তিনবার।
হেট ছেড়ে বৈসে কান্দে জারে জার।।
দুখের কান্দনে হেলে বিবির আসন।
অন্তরে ধেয়ানে বিবি জানিল তখন।

তখনই বনবিবি তার সামনে প্রকট হয়। তাকে দেখে দুখেকে খেতে আসা নরখাদক বাঘটি পালিয়ে যায়। বাঘের মুখ থেকে দুখেকে উদ্ধার করে বনবিবি তাকে নিজ আস্তানায় নিয়ে যায়। এদিকে গ্রামে ফিরে এসে ধোনা মৌলে সর্বত্র রটিয়ে দেয় যে, দুখেকে জঙ্গলের বাঘে খেয়েছে। এই খবর শুনে দুখের মায়ের পাগলপ্রায় হওয়ার উপক্রম। বনবিবি সর্বজ্ঞ। তিনি সবটাই জানতেন। তাই তিনি পরে কুমিরের পিঠে চড়িয়ে দুখেকে গ্রামে ফেরত পাঠান, তার মায়ের কাছে।

এদিকে গ্রামে ফিরে আসার পর দুখের মুখ থেকে বনবিবির অপার করুণার কথা শুনে দুখের মা বনবিবির নামে শিন্নি দেওয়া শুরু করে। দ্রুতই বনবিবি ও দুখের কাহিনি সুন্দরবন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বনবিবি সাধারণ মানুষের রক্ষাকর্ত্রী হিসাবে পুজোর জায়গা নেয়। সেই থেকে বনবিবির পূজার প্রচলন হয় এই অঞ্চলে।

পুঁথি বলে, ঐ বাঘটি ছিল রাজা দক্ষিণ রায় স্বয়ং। এ নিয়েও প্রচলিত রয়েছে একটি ভিন্ন কাহিনি। বাঘরূপী রাজা বার বার বনবিবির কাছে পরাজিত হয়ে বনের আরেক পীর গাজীর কাছে সহায়তা চায়। গাজী দক্ষিণ রায়ের সব কথা শোনে। তাদের মধ্যে যখন কথাবার্তা হচ্ছিল তখন সেখানে অকস্মাৎ উপস্থিত হয় শাহ জঙ্গলি। শাহকে দেখে দক্ষিণ রায় ভয়ে গাজী পীরের পেছনে পালায়। গাজী শাহকে অনুরোধ করে দক্ষিণ রায়কে ক্ষমা করে দিতে। কিন্তু শাহ জঙ্গলি নরখাদককে কোনোভাবেই ক্ষমা করবে না বলে জানায়। পরে গাজী তাকে নিয়ে বনবিবির কাছে যায়। বনবিবি দুখের কষ্ট লাঘবের বিনিময়ে দক্ষিণ রায়কে ক্ষমা করবে জানায়। তাতে রাজী হয় গাজী। বনবিবি দুখেকে স্বপ্নে দেখা দেয় এবং জানায় গাজী পীর ও দক্ষিণ রায়ের নাম স্মরণ করলে তার আর অর্থ কষ্ট থাকবে না। বনবিবির কথা সত্যি

হয়। এ কাহিনি পুঁথিতে বর্নিত আছে।

বনবিবি তখন দক্ষিণ রায়কে জানালেন আঠারো ভাটিতে কেউ যদি মা বলে তাকে ডাকে তাহলে দক্ষিণ রায় তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। পুঁথির ভাষায় :

আঠারো ভাটির মাঝে আমি সবার মা।
মা বলি ডাকিলে কারো বিপদ থাকে না।
বিপদে পড়িলে যেবা মা বলি ডাকিবে।
কভু তারে হিংসা না করিবে।

দক্ষিণ রায় বনবিবিকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে সে যেভাবে চাইবে সেটিই হবে।

বনবিবির অলৌকিক ক্ষমতা ও মানুষের প্রতি সদাচারের বর্ণনা পাওয়া যায় 'বনবিবি কেরামতি' বা 'বোনবিবির জহুরানামা' নামক কয়েকটি গ্রন্থে। বোনবিবির জহুরনামা পীরমাহাত্ম্য বিষয়ক পাঁচালি কাব্য। মধ্যযুগীয় লোকসমাজে রোগশোক ও হিংস্র জীবজন্তুর প্রকোপ থেকে বাঁচতে এই লোকায়ত দেবীর পুজো করতো, তাদের নিকট মানত করতো এবং শিন্নি দিতো। সেই ধারা এখনো বহমান। আজও সুন্দরবনের মধু সংগ্রাহক, মৎস্যজীবী ও কাঠুরেদের কাছে আরবকন্যা বনবিবি রক্ষাকর্ত্রী হিসাবে পূজিত। তারা মনে করেন বাঘের সামনে পড়লে বনবিবির নাম স্মরণ করলে বাঘ সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যায়। গভীর বনে মধু সংগ্রহ, মাছ ধরতে বা কাঠ সংগ্রহ করতে যাওয়ার আগে এ অঞ্চলের মৌয়াল, মৎস্যজীবী ও কাঠুরেরা বনবিবির উদ্দেশ্যে ক্ষীরাদি অন্নযোগে শিন্নি দেয়। বনবিবির উদ্দেশ্যে এভাবে প্রার্থনা জানায় :

মা বনবিবি, তোমার বালক এলো বনে
থাকে যেন মনে।
শত্রু দুশমন চাপা দিয়া রাখো গোড়ের কোণে।।
দোহাই মা বরকদের, দোহাই মা বরকদের।

বনবিবির শিন্নি বা পুজোর কোনো পুরুত নেই। এমনকি নেই কোনো মন্ত্র। ভক্ত বনবিবির স্মরণে একটা মোরগ বনের দিকে তাড়িয়ে দিলেই বনবিবিকে তুষ্ট করা হয়ে যায়।

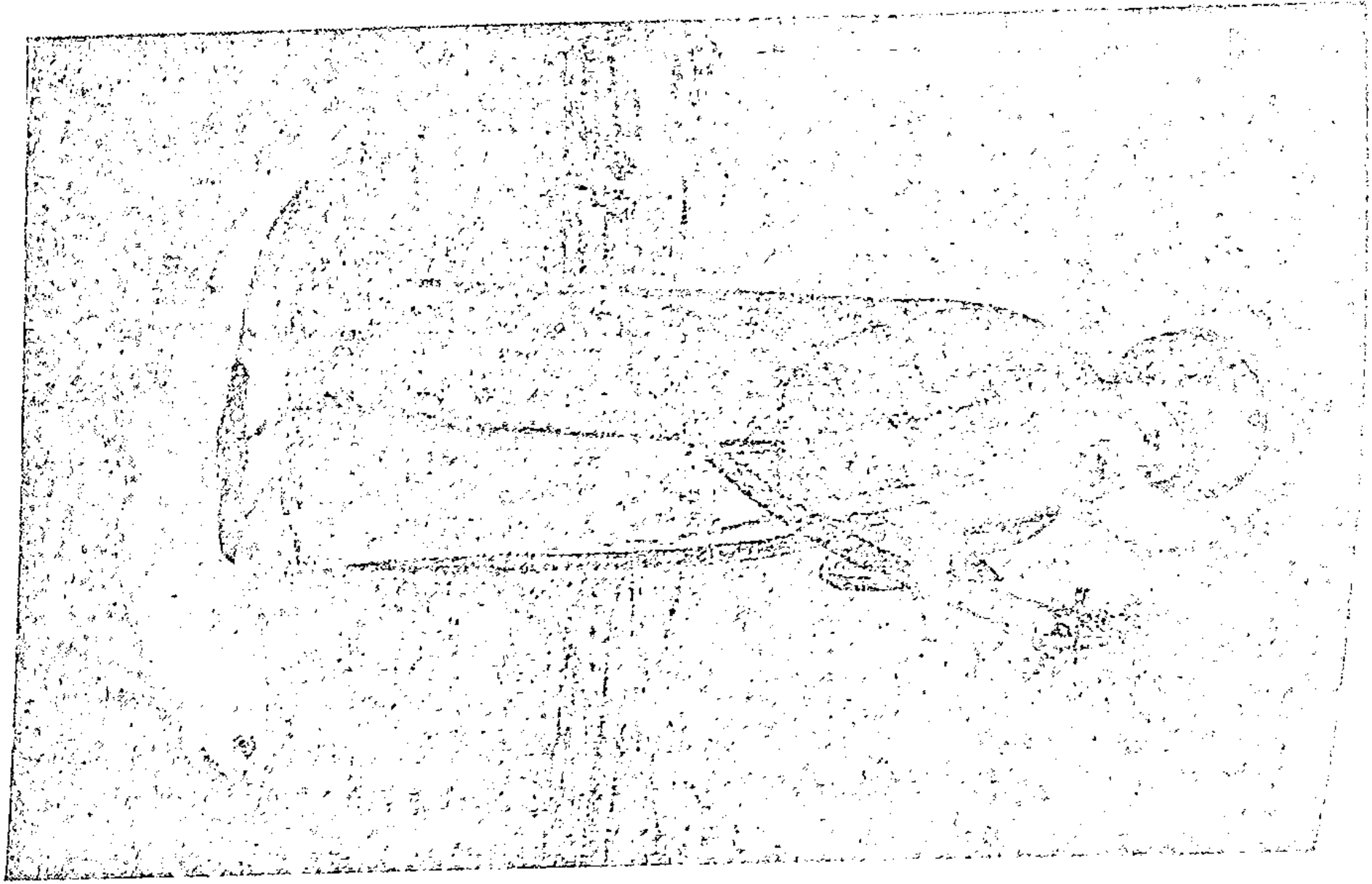

পিতা শাহ সিকান্দর কর্তৃক রাজ্যের শাসনভার গ্রহণের আদেশটি প্রত্যাখ্যান করে ফরিকি গ্রহণের সিদ্ধান্ত জানান, তখন তাকে বিভিন্ন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কঠিন সব পরীক্ষার মধ্যে একটি পরীক্ষা ছিল সমুদ্রের গভীর জলরাশির মধ্য থেকে একটা সূঁচ খুঁজে এনে দেওয়া। সেই পরীক্ষাটি খোয়াজ খিজিরের সহায়তায় পার হয়েছিল গাজী। স্রষ্টার কাছে গাজী সাহায্যের ফরিয়াদ জানালে স্রষ্টা তার প্রার্থনা শোনেন, এবং খোয়াজ খিজিরকে নির্দেশ দেন গাজীকে সাহায্য করতে। খোয়াজ খিজির তখন সমুদ্রের সব জল শুকিয়ে ফেলেন এবং গাজীকে তার কাঙ্ক্ষিত সূঁচটি এনে দেন।

খোয়াজ খিজিরকে নিয়ে কিছু কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে বঙ্গদেশে। বলা হয়ে থাকে খোয়াজ খিজির শুধু পানির নিচের সম্রাজ্যের শাসকই নয়, একই সাথে সে পানির নিচে থাকা সব ধনসম্পদেরও মালিক। দরিদ্র লোকেদের প্রতি সবসময় সদয় থাকেন। বলা হয়, একসময় যদি কোনো অভাবী লোক অর্থকষ্টে পড়ে কোনো দিঘি বা জলাশয়ের তীরে গিয়ে খোয়াজ খিজিরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতো, তখন জলের ওপর একটি সোনার সিন্দুক ভেসে উঠত। সিন্দুকটি থাকতো নানাবিধ রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ। সেখান থেকে কেবল যে-কোনো একটি ধন বা রত্ন তুলে নেওয়া যেত। একের অধিক ধন তুলে নেওয়া ছিল একেবারেই নিষিদ্ধ। যদিও সিন্দুকে থাকা প্রতিটি ধনই ছিল বহু মূল্যবান। শুধু ধনসম্পদই নয়, একসময় দিঘির জল থেকে বিভিন্ন তৈজসপত্রও ভেসে উঠতো বলেও বঙ্গদেশের আনাচেকানাচে জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। কথিত আছে সেগুলোর মালিকও এই খোয়াজ খিজির। তবে এখন আর খোয়াজ খিজির কাউকে সহায়তা করেন না। এ নিয়েও একটি জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে।

কথিত আছে, একবার এক দরিদ্র মাঝি অর্থকষ্টের পীড়া সহ্য করতে না পেরে খোয়াজ খিজিরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তার আহ্বানে সাড়া দেন খোয়াজ খিজির। জলে ভেসে ওঠে খোয়াজ খিজিরের রত্নরাজি ও মণিমাণিক্যতে পরিপূর্ণ সোনার সিন্দুক। সিন্দুকটি থেকে একটি মূল্যবান রত্ন তুলেও নেয় সে। কিন্তু সম্পদের প্রাচুর্যতা দেখে নিজের লোভকে সংবরণ করতে পারেনি। সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সিন্দুকটি থেকে একের অধিক সম্পদ তুলে নেয় এবং বাড়ি ফিরে আসে। বাড়ি ফিরে কাউকে কিছু বলেনি। সবটা নিজের ভেতরে গোপন রাখে। বাড়িতে থাকা বিশালাকার খড়ের গাঁদার মধ্যে চুরি করে আনা রত্নটি লুকিয়ে রাখে।

মাঝি যখন রাতে ঘুমিয়ে পড়লো, তখন তার স্বপ্নে হাজির হলো পানির রাজা খোয়াজ খিজির। স্বপ্নের ভেতর খিজির তাকে চুরি করে আনা অতিরিক্ত

রত্নটি দিঘির জলে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে বলল। তখনই মাঝির ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে নিছক স্বপ্ন ভেবে এড়িয়ে গেল। গা করলো না। চুরি করে আনা রত্নটিকে নিজের কাছেই রেখে দিলো। পরদিন রাতে মাঝি যখন গভীর ঘুমে মগ্ন, একইভাবে খিজির তার স্বপ্নে হাজির হলো এবং আগের মতোই চুরি করে আনা রত্নটিকে দিঘির জলে ফিরিয়ে দিতে বলল। কিন্তু এবারও মাঝি তার কথা কানে তুলল না। তৃতীয় রাতেও মাঝি যখন ঘুমালো, খিজির তাকে স্বপ্নের মধ্যে দেখা দিলো। এবার পানির রাজাকে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছিল। মাঝিকে সে নির্বংশ হওয়ার এবং কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হওয়ার অভিশাপ দিলো এবং সেই সাথে জানিয়ে দিলো মাঝির লোভ এবং বার বার চুরির ধনটি ফিরিয়ে দিতে বলার পরেও ফিরিয়ে না দেওয়ার শাস্তিস্বরূপ এরপর থেকে সব মানুষ খোয়াজ খিজিরের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে।

তৎক্ষণাৎ ঘুম ভেঙে যায় মাঝির। মনের ভেতর খচখচ করতে শুরু করলো তার। দ্রুত বিছানা থেকে নেমে চুরি করে আনা রত্নটি পরীক্ষা করতে খড়ের গাঁদার দিকে ছুটল। সেখানে গিয়ে দেখল রত্নটি আর জায়গা মতো নেই। তখনই বোধোদয় মাঝির। নিজের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় না। খোয়াজ খিজিরের অভিশাপে এক এক করে তার সব ক'টি সন্তান মারা যায়। আর সেই মাঝি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এরপর থেকে আর কখনোই মূল্যবান ধনসম্পদে পরিপূর্ণ খোয়াজ খিজিরের সিন্দুককে জলের ওপর ভেসে উঠতে দেখা যায়নি।

কাহিনিটির আরেক রূপও রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, কোনো এক হতদরিদ্র্য ব্যক্তি তার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে খোয়াজ খিজিরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে খিজিরের পক্ষ থেকে সাহায্যের আশ্বাস মেলে। লোকটির বাড়িতে রত্নরাজি থেকে প্রয়োজনীয় থালা-বাটি সরবরাহ করা হয় লোকটির বাড়িতে। উল্লেখ্য, সেগুলোর সবই ছিল সোনার তৈরি। যাই হোক, যথারীতি লোকটির মেয়ের বিয়ে ঠিকঠাকভাবেই সম্পন্ন হলো। সময় এলো বাসনকোসনগুলো ধুয়ে ফেরত দিয়ে আসার। কিন্তু তখন লোকটার স্ত্রীর মনের মধ্যে লোভ জন্ম নিলো। সে তার স্বামীকে না জানিয়ে বাসনকোসনগুলোর মধ্য থেকে একটা স্বর্ণের থালা লুকিয়ে রাখলো।

পরিষ্কার থালাবাসনগুলো নিয়ে লোকটা নদীর ধারে গেল ফেরত দিতে। সেগুলো যখন নদীর জলে ছেড়ে দিলো অদ্ভুতভাবে কেন যেন ডুবল না, বরং ভেসে রইলো পানির ওপর। বার বার চেষ্টা করার পরেও কোনোভাবেই সেগুলো পানির তলায় তলিয়ে গেল না। বাধ্য হয়ে লোকটা সব বাসনকোসন

বাড়িতে ফেরত নিয়ে এলো।

সেদিন রাতেই লোকটার স্বপ্নে খোয়াজ খিজির হাজির হলেন। তাকে বলা হলো সবগুলো বাসনকোসন ফেরত দিতে, নচেৎ তার মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে নায়রী আসার সময় জামাইসহ নৌকা ডুবিতে মারা যাবে। এমন অভিশাপে ভয় পেয়ে গেল লোকটা। পাবেই বা না কেন? পরের দিনই যে তার মেয়ে স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে নায়রী আসবে। পরদিন সকালে উঠে স্বপ্নের কথা তার স্ত্রীকে খুলে বলল। কিন্তু তার স্ত্রী একটা থালা লুকিয়ে রাখার বিষয়টি তখনো তার কাছে গোপন করলো। লোকটা সন্ধ্যার দিকে আবারও নদীতে গেল বাসন ফেরত দিতে। কিন্তু বরাবরের মতো থালাবাসনগুলো জলের তলায় তলিয়ে গেল না। সেই সময় দেখলো নদীতে একটা নৌকা, ঘাটের দিকেই এগিয়ে আসছে। একটু কাছাকাছি আসতেই দেখলো, নৌকাতে রয়েছে তার মেয়ে আর মেয়ের জামাই। লোকটার চোখের সামনেই ঘটল হৃদয় বিদারক ঘটনাটি। কোনো ধরনের ঝড় ছাড়াই একেবারে শান্ত নদীর জলের মধ্যে ডুবে গেল নৌকাটি। আর তৎক্ষণাৎ বাসনকোসন-গুলোও জলের তলায় তলিয়ে গেল। সেই ঘটনার পর থেকে আর কখনো খোয়াজ খিজিরের সিন্দুক বা বাসনকোসন ভেসে উঠতে দেখা যায়নি।

খোয়াজ খিজিরকে নিয়ে বাংলাদেশে বেশ প্রচলিত জনশ্রুতি রয়েছে। যেমন তাকে আবে হায়াতের উৎসমূল হিসাবে গণ্য করা হয়। তিনি নৌকাডুবির হাত থেকে রক্ষা করেন। আবার তাকে সামুদ্রিক ঝড়-তুফানের কারণ বলেও বিশ্বাস করা হয়। এ সম্পর্কে *নছর মালুম* পালাগানে প্রমাণ মেলে। তুফান উঠলে মাঝিরা বলে ওঠে, 'কেরামত করে বুঝি খোয়াজ খিজির।' অবশ্য মাঝীমাল্লারা এও বিশ্বাস করেন পীর খোয়াজ কেবল বিপদ ডেকেই আনেন না, ভক্তের বিপদ দূর করেও থাকেন। তাই তো নদী বা সমুদ্রে বিপদে পড়লে মাঝিরা তাকে স্মরণ করে। কবির ভাষায়,

দরেয়ার পীর সেই খোয়াজ খিজির,
শুনিল শুনিল যেন তাহার জিকির।

খোয়াজ খিজিরকে নিয়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলে একটি লোককথা প্রচলিত রয়েছে। বলা হয়ে থাকে, খোয়াজ খিজিরের জন্মের পর কোনো এক দরবেশের নির্দেশে তার মা মাত্র দু'মাস বয়সে তার বৈবাহিক সম্পর্কজুড়ে দেন এক যুবতী কন্যার সাথে। কিন্তু মেয়ের বয়স বেশি হওয়ায় লোকনিন্দা শুরু হয়। একটা সময় তা অসহনীয় পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলে স্ত্রী কর্তৃক জলে

নিক্ষেপিত হোন। তখন তিনি একটা বেরা বা কলার ভেলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্ত্রীর উদ্দেশ্যে সেই সময় শিশু খোয়াজ বলেন, আর আড়াই দিন অপেক্ষা করলে তারা ধনী হতে পারতো। এতে মনের কষ্টে খোয়াজের স্ত্রী জলে ঝাপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়। আর সেই থেকে খোয়াজের জায়গা হয় পানিতে।

যদিও কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে আরেকটু ভিন্নভাবে গল্পটি প্রচলিত। সেখানে বলা হয়, ছ'মাস বয়সে খোয়াজকে তার মা এক যুবতী কন্যার সাথে বিয়ে দেন। কিন্তু সমাজস্থ লোকের কটুবাক্য ও নিন্দায় মেয়েটির জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলে কলার ভেলা বানিয়ে তাতে করে খোয়াজকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। ভেলা যখন মাঝ নদীতে, তখন শিশু খোয়াজ হেসে উঠে তার স্ত্রীকে বলে, যদি সে সতী হয়, তবে কেয়ামতের দিন তাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হবে।

বিশ্বাস করা হয়, নদী বা সমুদ্রের তীর হতে একটানা চল্লিশ দিন ধরে নজর রাখলে পীর খোয়াজ খিজিরকে দেখা যায়।

ধারণা করা হয় ১৩শ শতকের দিকে তুর্কি শাসকদের মাধ্যমে খোয়াজ খিজির বঙ্গদেশে প্রবেশ করে এবং স্থায়ীভাবে এ অঞ্চলের মানুষের মাঝে স্থান করে নেয়। নদনদী, খালবিল ও হাওড় অধ্যুষিত অঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা যে-কোনো ধরনের জলের অকল্যাণকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য জলের পীর বা রাজা খোয়াজ খিজিরের উদ্দেশ্যে বেরাভাসান উৎসবের আয়োজন করে থাকে। ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার বেরা বা কলার ভেলা ভাসিয়ে থাকে। এটি একটি লোকউৎসব। কোথাও কোথাও এটি সামাজিক, পারিবারিক বা ফকির সম্প্রদায়ের উদ্যোগে পালিত হয়। বলা হয়ে থাকে, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার নবাব-নায়েব-নাজিমরাও খোয়াজ খিজিরের ভক্ত ছিলেন। মুকাররম খান, মীর কাশিমসহ অনেকেই মহাসমারোহে ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে ঢাকার বুড়িগঙ্গায় এবং মুর্শিদাবাদের ভাগীরথী নদীতে বেরা ভাসিয়েছিলেন জনশ্রুতি রয়েছে।

বেরা তৈরির জন্য যে কলাগাছের প্রয়োজন তা সংগ্রহের জন্য গাছের মালিকের অনুমতি নিয়ে কলাবাগানে গিয়ে গাছের উদ্দেশ্যে বলা হয়, "মা গঙ্গা ও খোয়াজ খিজিরের বেরা তৈরির জন্য সাতটি কলাগাছ চাই।" পরবর্তীতে এক কোপে কাটা হয় সাতটি কলাগাছ। কেটে নেওয়া গাছ থেকেই তৈরি করা হয় বেরা। উল্লেখ্য, একটি বেরাভাসান গানে গানে খোয়াজ ও গঙ্গার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের কথাও রয়েছে। তবে এসব ঘটনার আদৌ কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি। সবটাই যুগের পর যুগ ধরে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে।

মসজিদের অলৌকিক কাহিনি

আমাদের দেশের আনাচেকানাচে অনেক মসজিদ রয়েছে, যেগুলোকে কেন্দ্র করে প্রচলিত আছে বিভিন্ন জনশ্রুতি তথা কিংবদন্তী। এ ধরনের কিংবদন্তীগুলোকে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কিংবদন্তী ভুল হবে না। এসব মসজিদের কোনো কোনোটির ক্ষেত্রে এমনও শোনা যায়, সেগুলো নাকি রাতারাতি তৈরি হয়েছে কোনোরকম মানুষের সহায়তা ছাড়াই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের মসজিদ গায়েবী মসজিদ নামেই বহুল পরিচিত। এ তো এক রকমের মসজিদের কথা, এছাড়াও এমন মসজিদ রয়েছে যেগুলোতে মাঝরাতে অদ্ভুত সব ব্যক্তিদের উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা করতে দেখা যায় বলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে গুঞ্জন প্রচলিত আছে। শুধু তাই নয়, এমন অনেক মসজিদেরও কথা শোনা যায় যেগুলোর নাকি আবার অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ঐ মসজিদগুলোতে গিয়ে মানত করলে মানুষের মনের আশা পূরণ হয়।

এগুলো কেবল যে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত কথার কথা, কিংবা নিছক গল্পের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তা কিন্তু নয়। বরং আমাদের দেশের মানুষদের বেশ বড়ো একটা অংশ এসব গল্প বা কাহিনিকে মনেপ্রাণে সত্য বলেও মেনে থাকে। শুধু তাই নয়, এ ধরনের জায়গাগুলোকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির চোখে দেখে থাকে। এরকম কিছু মসজিদকে কেন্দ্র করে প্রচলিত জনশ্রুতি বা কিংবদন্তী থাকছে বইয়ের এ অংশে।

।। ১. পাতরাইল মসজিদ ।।

পাতরাইল মসজিদ আমাদের দেশের প্রাচীন মসজিদগুলোর একটি। ধারণা করা হয়, মসজিদটির প্রতিষ্ঠা সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ। মসজিদটি 'মজলিশ আউলিয়া মসজিদ' নামেও সুপরিচিত। আয়তাকার মসজিদটি দশ গম্বুজবিশিষ্ট। রয়েছে পাঁচটি দরজা। স্থাপত্যশৈলীর দিক থেকে রাজশাহীর ছোটো সোনা মসজিদ ও বাঘা মসজিদের সাথে এই মসজিদের সাদৃশ্য বিদ্যমান। ফরিদপুর জেলার ভাঙা উপজেলার আজিমনগর ইউনিয়নের অন্তর্গত পাতরাইল নামক জায়গায় এই মসজিদটি অবস্থিত। স্থানীয়দের কাছে জায়গাটি দিঘির পাড় নামেও পরিচিত।

পুরোনো এই মসজিদটি। শোনা যায় এই মসজিদটিও নাকি গায়েবী ছিল। অর্থাৎ, কে বা কারা এই মসজিদটি তৈরি করেছে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই। স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী মসজিদটি এক রাতের মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা বলে তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

যদিও বর্তমানে মসজিদটি আর সম্পূর্ণরূপে অক্ষত অবস্থায় নেই। এর তিনভাগের একভাগ মাটির নিচে দেবে গেছে। অবশ্য বাকি দুইভাগ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। মাটির নিচে দেবে যাওয়া একভাগ সম্পর্কে কথিত আছে, রাতের অন্ধকারে মসজিদটি যখন আপনাআপনি মাটির নিচ থেকে উঠছিল, তখন কেউ একজন অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে উপস্থিত হয়। চোখের সামনে এমন অদ্ভুত ঘটনা দেখে লোকটা কী করবে ঠিক বুঝতে উঠতে পারলো না। ভয়ে ভয়ে মসজিদটির কাছে এগিয়ে গিয়ে আনমনেই ওটাকে ছুঁয়ে দেয়। ফলাফলস্বরূপ, মসজিদটির তিনভাগের একভাগ আর মাটির নিচ থেকে আর উত্থিত হয়নি।

স্থানীয়রা আরো মনে করেন, মসজিদটি যেমন অলৌকিকভাবে তৈরি হয়েছে, তেমনি এর রয়েছে অলৌকিক ক্ষমতা। এখানে মানত করলে রোগমুক্তি, বিপদআপদ থেকে পরিত্রাণসহ নানাবিধ সমস্যার সমাধান হয় বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

কথিত আছে, নামাজের সময় হয়ে মসজিদটিতে কোথা থেকে লোকজন এসে উপস্থিত হয় তা কেউ বলতে পারে না। মধ্যরাতে জিনেরা এই মসজিদের ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকে বলেও কিংবদন্তী প্রচলিত।

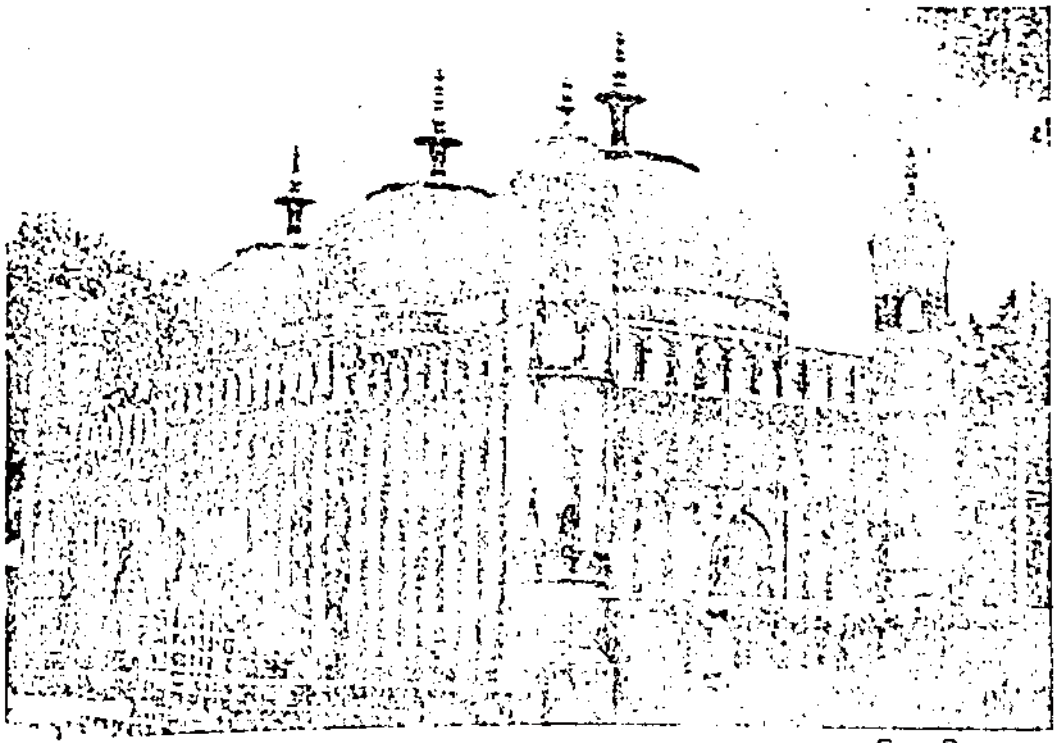

।। ৩. নিদাড়িয়া মসজিদ ।।

লালমণিরহাট জেলার নিদাড়িয়া মসজিদটি নিয়ে প্রচলিত রয়েছে একটি কিংবদন্তী। সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের কিসমত নগরবন্দ মৌজায় অবস্থিত নিদাড়িয়া মসজিদ। কথিত আছে, মোগল সুবাদার মাসুদ খাঁ তার পুত্র মনছুর খাঁ'র তত্ত্বাবধায়নে এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। শোনা যায়, সুবাদার মাসুদ খাঁ'র কোনো দাড়ি ছিল না। তাই তিনি আল্লাহ্'র কাছে প্রার্থনা করেন যেন যদি তার একটিও দাড়ি গজায় তাহলে তিনি শোকরিয়া যাপনের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করবেন। এ সম্পর্কে যে কিংবদন্তীটি রয়েছে তা থেকে জানা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা সুবাদার মাসুদ খাঁ'র প্রার্থনা গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাকে কেবল একটিমাত্র দাড়িই দান করেছিলেন। মুখে দাঁড়িয়ে গজানোর পর পূর্বের করা মানত পূরণ করতেই তিনি তার পুত্র মনছুর খাঁ'কে দিয়ে নিদাড়িয়া মসজিদটি নির্মাণ করান। অবশ্য কোথাও কোথাও শোনা যায়, সুবাদার মাসুদ খাঁ নয়, বরং তার পুত্র সুবাদার মনছুর খাঁ'রই মুখে কোনো দাড়ি ছিল না।

।। ৪. খাঁ মসজিদ ।।

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত রাঙ্গুনিয়া থানার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে, কর্ণফুলী নদীর বাম তীর ঘেঁষে পোমরা গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে আনুমানিক প্রায় আড়াইশ বছরেরও বেশি সময় আগে নির্মিত হয়েছে এমন একটি অতি পুরাতন মসজিদের অস্তিত আজও বিদ্যমান। স্থানীয়দের কাছে এটি খাঁ মসজিদ নামে পরিচিত।

কথিত আছে, একসময় এই জায়গাটি ছিল ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ এবং ছোটো ছোটো টিলায় ঘেরা। আজও এখানে ছোটো ছোটো টিলার উপস্থিতি বিদ্যমান। এই টিলাগুলো আজ থেকে বহুকাল আগে হরিণ বিচরণের ক্ষেত্র ছিল বলে শোনা যায়। মসজিদটির নির্মাণের ব্যাপারে লোকমুখে একটি গল্প শোনা যায়। এখানকার অধিবাসীরা বলেন, একবার জনৈক খাঁ সাহেব সদলবলে এখানে হাজির হোন হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যে। আর তাই থাকার প্রয়োজনে তিনি এখানে একটি অস্থায়ী শিবির স্থাপন করেন। তিনি একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করলেন। এখানে হাতে গোণা যে ক'টি মুসলিম পরিবারের বসবাস, তাদের ইবাদতের জন্য কোনো মসজিদ নেই। তাই তিনি এখানে একটি মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। কাজটাও

বেশ পুণ্যের। তাই যেই ভাবা সেই কাজ।

তখন এখানকার জমিদার ছিলেন কান্ত হাজরা। খাঁ সাহেব জমিদারের কাছ থেকে সামান্য জমি কিনে নেন মসজিদ স্থাপনের জন্য। শুরু হলো মসজিদ নির্মাণের কাজ। আগেই বলেছি, এখানে খাঁ সাহেব আসার আগে কোনো মসজিদ ছিল না। অথচ অবাক করার মতো ব্যাপার হলো, খাঁ সাহেব পরবর্তীকালে যেখানে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, সেটির দক্ষিণাংশে একটি টিলা ছিল, যেটির পাদদেশ থেকে ভেসে আসছিল আজানের ধ্বনি। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক ওয়াক্তে গায়েবী আজানের ধ্বনি ভেসে আসতো টিলার পাদদেশ থেকে। ব্যাপারটা খাঁ সাহেবকে বিস্মিত করলো। আজানের উৎসের সন্ধান করে কোনো লাভ হলো না। যা হোক, দুই-তিনদিনের মধ্যেই খাঁ সাহেব তার মসজিদটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করলেন। কিন্তু অবাক করার মতো বিষয়টি হলো, মসজিদ নির্মাণ শেষ হলেও থেমে থাকলো না গায়েবী আজান।

পূর্বের মতো প্রতি ওয়াক্তে আজানের ধ্বনি ভেসে আসার অদ্ভুত ব্যাপারটি অব্যাহত রইলো। এমতাবস্থায় খাঁ সাহেবের মনে হলো তিনি কোনো মহান সাধকের সান্নিধ্যে এসেছেন, যে কারণে তার সাথে এমনটা ঘটছে। নির্মিত মসজিদটি ভেঙে যে জায়গা থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে আসছিল সেখানে তিনি নতুন করে আরেকটি মসজিদ করান। এরপর থেকে আর গায়েবী আজানের ধ্বনি শোনা যায়নি।

কথিত আছে মসজিদটি নাকি অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্নও। এখানে মানত করে শিন্নি দিলে মানুষের মনের বাসনা পূরণ হওয়ার জনশ্রুতিও রয়েছে। শুধু তাই নয়, একসময় রাতের বেলাতে একা একা এই মসজিদে কোনো লোক আসতে চাইতো না বললেই চলে। শোনা যায়, মসজিদটিতে নাকি একসময় নামাজরত অবস্থায় সাদা পোশাক পরিহিত লোকদের আনাগোনা ছিল, যাদের কেউই এখানকার বাসিন্দা ছিলেন না।

মসজিদ সংলগ্ন একটি চৌবাচ্চা রয়েছে। বলা হয়ে থাকে, একসময় রেওয়াজ ছিল যে মসজিদ নির্মাণ করলে সাথে একটা পুকুরও খনন করতে হতো। মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন হলে খাঁ সাহেব মসজিদ সংলগ্ন জায়গায় পুকুর নির্মাণ করতে জমিদারের নিকট প্রয়োজনীয় জমি প্রার্থনা করলে জমিদার তা দিতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে ছোট্ট চৌবাচ্চা নির্মাণ করেই তাকে সন্তুষ্ট হতে হয়েছিল। লোকমুখে শোনা যায়, একসময় প্রতি শুক্রবারে একবেলা খাবার খাওয়ার জন্য এই মসজিদে দুঃস্থ লোকেদের আনাগোনা ছিল। অনেকসময় অতিরিক্ত খাবার চৌবাচ্চা নিক্ষেপ করা হতো, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এতে করে চৌবাচ্চাটির পানি নষ্ট হতো না।

দক্ষিণ রায় একজন সুপুরুষ লৌকিক দেবতা। তার মতো লৌকিক দেবতা অতি বিরল। মাথায় বাবরি চুল। কানে কুণ্ডল। কপালে রক্ত তিলক। চোখ দুটো বেশ চওড়া ও রক্তাভ। টিকালো নাক। পরিপুষ্ঠ গোঁফ। বেশভূষায় একজন রাজযোদ্ধা। কাঁধে ধনুক। পিঠে শর ভর্তি তূণীর। কোথাও কোথাও আবার তলোয়ার বা কুঠার হাতেও তাকে দেখা যায়। পিঠে দেখা যায় ঢাল। কোনো কোনো থানে তাকে দেখা যায় ঘোড়া বা বাঘের পিঠে আরোহণ করা অবস্থায়। কবির ভাষায় দক্ষিণ রায়ের স্বরূপ মেলে এভাবে :

রজনী শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘপৃষ্ঠে আরোহণ এক মহাজন।।
করে ধনুঃ শর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিলো মোরে দক্ষিণের রায়।।

ব্যাঘ্রদেবতা রাজা দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্য প্রচার শুরু হয় সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দীতে রচিত মঙ্গলকাব্যে। অরণ্যবাসীরা যে কয়জন দেবদেবীর আরাধনা করে, তাদের মধ্যে দক্ষিণ রায় অন্যতম। তাদের বিশ্বাস দক্ষিণ রায়ের পূজা ভিন্ন কোনোরূপ কাজ শুরু করলে তার ফলাফল মোটেও ভালো হয় না। মঙ্গলকাব্যের কবির ভাষায় :

পাঁচালি প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার
আঠারো ভাটির মধ্যে হইবে প্রচার।।
তোমার কবিতা যার মনে নাহি লাগে।
সবংশে তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে।।

অর্থাৎ, দক্ষিণ রায় কবিকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে কাব্য-গীতি-গাঁথা রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর মাহাত্ম্য প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সাথে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে কেউ যদি তার প্রচারকৃত মাহাত্ম্য বিশ্বাস না করে বা দক্ষিণ রায়কে সম্মান না করে তাহলে সবংশে বাঘের খাদ্যে পরিণত হবে।

যেহেতু কিংবদন্তীগুলো লোকমুখে বেঁচে থাকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, এতে করে গল্পের সাথে নতুন করে অনেককিছু যুক্ত হয়, আবার কখনো কখনো বাদ যায় অনেককিছু, তেমনি নতুন করে ঢেলে সাজানোও হয়। যেমন কবি কৃষ্ণরাম কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য থেকে দক্ষিণ রায়ের যে পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে তার বাবার নাম উল্লেখ করা হয়েছে রাজা প্রভাকর। কথিত আছে, মানুষের জন্য বসবাস অনুপযোগী অরণ্যে ঘেরা অঞ্চলকে তিনি মানুষের বসবাস উপযোগী করেছিলেন, যা পরবর্তীতে 'আঠারো ভাটির

অঞ্চল' নামে পরিচিতি লাভ করে। বলা হয়, আঠারো ভাটির রাজা প্রভাকর ছিলেন নিঃসন্তান। তাই তিনি সন্তানের প্রত্যাশায় শিবের আরাধনা শুরু করলেন। তার আরাধনায় শিব তাকে পুত্র লাভের বর প্রদান করেন। শিবের বরেই রাজা প্রভাকর দক্ষিণ রায়কে নিজের পুত্র হিসাবে পেয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। পরবর্তীতে পিতার অবর্তমানে এ অঞ্চলের একচ্ছত্র অধিপতি হয় দক্ষিণ রায়।

কিন্তু অন্য একটি মঙ্গলকাব্যে দক্ষিণ রায়ের পিতার ভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায়। যেখানে বলা হয়েছে :

দণ্ড রক্ষ মুনি ছিল ভাটির প্রধান।
দক্ষিণ রায় নাম–আমি তাহার সন্তান।।

এই কাব্যটিতে দক্ষিণ রায়ের পিতার নাম বলা হচ্ছে রক্ষ মুনি, যিনি ভাটির প্রধান। এই ভাটি শব্দটি দ্বারা যে আঠারো ভাটির অঞ্চলকে নির্দেশ করা হচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আর প্রধান বলতে রাজা বোঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, এই মঙ্গলকাব্যটিতে এসে দক্ষিণ রায় নিজেকে আঠারো ভাটির রাজা রক্ষ মুনির পুত্র বলে পরিচয় দিচ্ছেন। অবশ্য অন্যত্র তার মায়ের নাম নারায়ণী বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলার লৌকিক দেবদেবীদের মধ্যে নারায়ণীও অন্যতম। বলা হয় দক্ষিণ রায়ের পরই নারায়ণীর স্থান।

দক্ষিণ রায়ের পরিচয় নিয়ে কেবল একাধিক কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে তা কিন্তু নয়। বরং দক্ষিণ রায় চরিত্রটাই বিভিন্ন কিংবদন্তী বা জনশ্রুতিতে মোড়া। একেক গল্পে তাকে একেকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। গাজী-কালু ও চম্পাবতির পালায় তাকে দেখা গেছে মুকুট রাজার সেনাপতি হিসাবে। আবার বনবিবির জোহুরনামায় দেখা গেছে মানুষরূপী নরখাদক বাঘ ও গাজীর বন্ধু রূপে। আবার দক্ষিণ রায়কে নিয়ে ভিন্ন সব গল্পও দেখতে পাবো।

দক্ষিণ রায় ও বড়খাঁ গাজীকে নিয়ে আরো যে গল্পটি পাওয়া যায়, সেই গল্পটি ইতোপূর্বে দক্ষিণ রায়কে নিয়ে বর্ণিত গল্প বা জনশ্রুতি দুটি থেকে একেবারেই ভিন্ন। এ গল্পে দক্ষিণ রায়কে অন্যতম নায়ক বলা চলে। গল্পের কাহিনির সূত্রপাত ঘটেছে অনেকটা এভাবে :

একবার ধনপতি সওদাগর বাণিজ্যে যাত্রা করেছিল। যাত্রাকালে আঠারো ভাটি অঞ্চলে উপস্থিত হলে জঙ্গলের মাঝে দক্ষিণ রায়ের মূর্তি বা বিগ্রহ গড়ে পূজা দিলো। কিন্তু সেই অঞ্চলের আরেক উপাস্য বড়খাঁ গাজীর শানে কিছুই করলো না। বিষয়টা গাজীর ভক্ত ফকিররা অবগত হলে তারা

তাকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য আসে। কিন্তু ধনপতি তাদেরকে কোনোপ্রকার গা করলেন না। ওপরন্তু জোরপূর্বক সেখান থেকে বিতাড়িত করে দিলেন। এতে করে গাজীর ভক্তরা অপমানিত বোধ করে। তারা গিয়ে হাজির হয় গাজীর থানে। সবটা খুলে বলে তাঁকে। পুরো ঘটনা শুনে ক্ষেপে যান গাজী। কটূক্তি করে বসে দক্ষিণ রায় সম্বন্ধে। শুধু এতে ক্ষান্ত হোন না। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আদেশ দেন দক্ষিণ রায়ের মূর্তি ধ্বংসের।

গাজীর হুকুমে ফকিরেরা দক্ষিণ রায়ের মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলল। ব্যাপারটা আর গোপন থাকলো না। দক্ষিণ রায়ের ভক্তরা যখন গাজীর ভক্তদের কাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারলো। তাদেরই একজন ছিল বটে বেনে। সে ছুটে গেল খড়িতে, যেখানে দক্ষিণ রায়ের বাড়ি। বটে বেনে দক্ষিণ রায়কে সবটা খুলে বলল, যা শুনে ক্রোধে ফেটে পড়লেন দক্ষিণ রায়। সিদ্ধান্ত নিলেন গাজীর সাথে যুদ্ধ করবেন। এমন অপমানে সমুচিত শিক্ষা দেবেন তাকে। কিন্তু দক্ষিণ রায়ের দরবারে উপস্থিত মন্ত্রীদের একজন পরামর্শ দিলেন, যুদ্ধ করার আগে অবশ্যই গাজীর মনোভাব জানা প্রয়োজন। দক্ষিণ রায় ভেবে দেখলে মন্ত্রীর পরামর্শটি ফেলে দেওয়ার মতো নয়। তাই পরামর্শটি গ্রহণ করলেন এবং গাজীর কাছে দূত প্রেরণ করলেন।

দূত গাজীর আস্তানায় হাজির হলে দেখতে পান গাজী কোরান পড়ছে। সঙ্গে আছে তার শিষ্যরা। গাজীকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন স্বর্গে অন্যান্য দেবতাদের সাথে ইন্দ্র বসে আছেন। কবির ভাষায় এর বর্ণনা পাওয়া যায় এভাবে :

ইন্দ্র যে স্বর্গ মাঝ, বড়খাঁ গাজীর সাজ।
দেখিয়া জুড়ায় দুটি আঁখি।
গীরিদা হেলান গা, মউর পুচ্ছের বা
খাবাসে তুলিয়া দেয় পান।
মাথায় চিকন কালা, হাতে ছিনিমিনি মালা,
গাজী পড়ে বসিয়া কোরান।।

দক্ষিণ রায়ের দূত গাজীকে নিজের পরিচয় দিয়ে যুদ্ধের ব্যাপারে তার মনোভাব জানতে চাইলে অত্যন্ত ক্রোধানিত্ব হোন গাজী। জবাবে বলেন,

আমল না পায় হাম, জাহির উনকি নাম,
তামাম মুলুক কিয়া হাত।

ভাটি অঞ্চলে দক্ষিণ রায়ের আধিপত্য থাকার কারণে গাজীকে সেভাবে কেউ

ক্ত-শ্রদ্ধা করছে না। দক্ষিণ রায়কে এ অধিকার থেকে অবশ্যই বঞ্চিত রবেন তিনি।

দূত ফিরি গিয়ে দক্ষিণ রায়কে গাজীর মনোভাব সম্পর্কে অবগত করলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন তিনি। এই যুদ্ধে তার সৈন্য ছিল তারই অনুগত বাঘেরা। তার আহ্বানে হাজারে হাজার মহাশক্তিধর বাঘ এসে হাজির হলো দক্ষিণ রায়ের খাড়ির বাড়িতে। রণসাজে সজ্জিত হলো দক্ষিণ রায়। পিঠে ঢাল। কোমড়ে গোঁজা ধারালো কাটারি। তূণীর ভর্তি তীর। আর ধনুক। রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় বাঘের পিঠে উপবেশন করলো দক্ষিণ রায়। বিশাল ব্যাঘ্রবাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য যাত্রা করলো উত্তর। দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধ যাত্রার বর্ণনা কবি এভাবে করেছেন :

হীরা বাঘে সাজিয়া রায় হইলো সোয়ার,
পৃষ্ঠে ঢাল কাঠারি কোমরে যমধার।
দুই তরকচ বাধা পরিপূর্ণ বাণ,
কোপেতে কম্পিত রায় করেতে কামান।
পঞ্চপাত্র চলে পঞ্চ বাঘের ওপর,
ঘোর অন্ধকার রাত্র আড়াই প্রহর।
দলবল বাঘের লইয়া মহাকায়,
ধাইল উত্তর মুখে দক্ষিণের রায়।

দলবল নিয়ে দক্ষিণ রায় খাড়ির উত্তরে অবস্থিত গাজীর সীমানাপ্রান্ত খানিয়ায় উপস্থিত হলো। সেই মুহূর্তে গাজীও তার সেনাদের নিয়ে উপস্থিত হলো সেখানে। দক্ষিণ রায়কে সাবধান করে দিলো সে। বলল-"আমি মোটেও সাধারণ কেউ নই। সৃষ্টিকর্তা আমাকেও পৃথিবীতে নিজের কেরামতি জাহির করার ক্ষমতা দিয়েছেন। তাই আঠারো ভাটি অঞ্চলে উৎপন্ন দ্রব্যাদি মোম, মধু, কাঠ, মাছের ওপর তোমার একলা রাজ করা চলবে না। সবকিছু তুমি একাই ভোগ করবে তা হবে না। এসবে আমারো অর্ধেক ভাগ থাকবে। আমার ক্ষমতা স্বীকার করে নিতে হবে।"

গাজীর এমন দাবীতে বিস্মিত হলো দক্ষিণ রায়। গাজীর অধিকার স্বীকার করে নিতে রাজী হলেন না। বরং উল্টো অপমান করে বসলেন। তাকে বললেন, "তুমি কোথাকার কে শুনি, যাকে অর্ধেক সম্পত্তির অধিকার দেবো? ভালো চাও তো এখান থেকে কেটে পড়।"

এতে করে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়লো। দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হলো ভয়াবহ মারামারি। উল্লেখ্য, দক্ষিণ রায়ের দলে যেমন ব্যাঘ্রসেনা ছিল,

গাজীর দলেও অনুরূপ ব্যাঘ্রসেনা। দুই দলের বাঘেদের মধ্যে ভীষণ লড়াই হলো। হতাহতের পরিমাণ নিছক ছিল না। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলো। কিন্তু তাতে কোনো সমাধান এলো না। শেষ পর্যন্ত দুই দলের প্রধান একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। সেই যুদ্ধ পেলো আরেক মাত্রার ভয়াবহতা।

দক্ষিণ রায় কিংবা গাজী কেউ কারোর চেয়ে কম যান না। দুজনে কেবল যে মহাশক্তিধর তা কিন্তু নয়, বরং একইসাথে আলৌকিক ক্ষমতার অধিকারীও। যুদ্ধের এক পর্যায়ে গাজী তার হাতের খড়্গ দিয়ে দক্ষিণ রায়ের মস্তক ধড় থেকে আলদা করে ফেলল। কাটা মস্তক গড়াগড়ি খেতে থাকলো মাটির ওপর। কিন্তু পরক্ষণেই ঘটলো আরেক চমৎকার। দক্ষিণ রায়ের ধড় থেকে যে মস্তকটি বিচ্ছিন্ন করে ফেলল দেখা গেল সেটি তার আসল মস্তক নয়। দক্ষিণ রায় যেমন ছিলেন তেমনই রয়েছেন। তার ধড়ের ওপর আগের মতোই মস্তকটি রয়েছে। বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে চলেছে দক্ষিণ রায়।

দুই পরাক্রমশালী বীরের মধ্যকার যুদ্ধে পৃথিবী ধারণ করলো ভয়ংকররূপ। এতে করে ভীত হয়ে পড়লেন স্বর্গের দেবতারা—এই বুঝি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায়! এমতাবস্থায় স্বর্গ থেকে আবির্ভূত হলেন এক বিধাতাপুরুষ, যিনি অর্ধেক মুসলিম ও অর্ধেক হিন্দু। সেই বিধাতাপুরুষের এক হাতে কোরান আরেক হাতে পুরাণ। মঙ্গলকাব্যে বিধাতাপুরুষের বর্ণনা যেরূপ পাওয়া যায়:

অর্ধের মাথায় কালা একভাগে চূড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি হাতে।
ধবল অর্ধেক কায় অর্থনীল মেঘ প্রায়
কোরান পুরাণ দুই হাতে।।

বিধাতাপুরুষকে দেখে দক্ষিণ রায় ও গাজী স্তম্ভিত হলেন। তখন তিনি দুজনকে নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব করতে বললেন। বিধাতাপুরুষের মধ্যস্থতায় দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হলো। তিনি দুজনের রাজ্যের সীমানাও নির্ধারণ করে দিলেন। হিজলী বাদ দিয়ে দক্ষিণ রায়কে সমগ্র ভাটির অধিকার দেওয়া হলো। হিজলী দেওয়া হলো গাজীর ভাই কালুকে। আর বলে দিলেন, এখন থেকে দক্ষিণ রায়ের মতো উভয় জায়গাতে গাজীও উপাস্য হবে। তবে কোনো বিগ্রহ থাকবে না। প্রতীক হিসাবে ঘট থাকবে। এভাবেই অবসান ঘটে দক্ষিণ রায় ও বড়খাঁ গাজীর মধ্যকার ভয়াবহ যুদ্ধের।

দক্ষিণ রায় ও গাজীকে নিয়ে আগে যে জনশ্রুতিটি বর্ণিত হয়েছিল সেটি আর এই জনশ্রুতিটির মধ্যকার পার্থক্য এতক্ষণে পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। এই জনশ্রুতিও সুন্দরবন অঞ্চলে জনপ্রিয়। মূলত দক্ষিণ রায়ের

ভক্তদের দ্বারাই এই জনশ্রুতির সৃষ্টি, প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। তবে যাই হোক না কেন, দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষ করে আরণ্যকবাসীদের মধ্যে দক্ষিণ রায় ও বড়খাঁ গাজী দুজনেই পূজনীয়।

দক্ষিণ রায়ের বারামূর্তি পূজার কারণ মূলত গাজী কর্তৃক তার মস্তক ধড় থেকে হওয়া। বড়োদহের সওদাগর দেবদত্ত বহুকাল আগে বাণিজ্য করতে দূর দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু এরপর আর নিজ দেশে ফিরে আসেননি। দেখতে দেখতে কয়েক বছর কেটে গেল কিন্তু দেবদত্তের ফেরার কোনো নাম নেই। তাই শেষমেশ দেবদত্তের কিশোরপুত্র পুষ্পদত্ত মনঃস্থির করলো নিজেই বের হবে পিতাকে খুঁজে বের করতে। শুরু হয়ে গেল যাত্রার সব বন্দোবস্ত। বিদেশ-বিভুঁইয়ে পুত্র যাতে নিরাপদে থাকে সেজন্য পুষ্পদত্তের মাতা বাড়িতে দক্ষিণ রায়ের পূজা করালেন। পূজা শেষে প্রসাদী এনে তুলে দিলেন পুত্রের হাতে এবং নির্দেশ দিলেন সে যেন সর্বদা পূজার প্রসাদী নিজের কাছে অতি যত্নের সাথে রাখেন। পুষ্পদত্ত সাহসী ও বুদ্ধিমান হলেও বয়সে ছিল কিশোর। তাই বিচক্ষণ প্রবীন কর্ণধারকে অভিভাবক করে তার যাত্রাসঙ্গী হিসাবে প্রেরণ করা হলো।

পথিমধ্যে খনিয়া নামক জায়গায় প্রথমবারের মতো যাত্রাবিরতি দিলো পুষ্পদত্তের তরী। খনিয়ায় দক্ষিণ রায়ের থান ছিল, কিন্তু সেই থানে বাঘের ওপর আসীন অবস্থায় দক্ষিণ রায়ের কোনো বিগ্রহ ছিল না। ছিল শুধু প্রতীক হিসাবে মণ্ডমূর্তি তথা ঘট। ব্যাপারটা অবাক করলো পুষ্পদত্তকে। এরকমটা সে এর আগে কখনো দেখেনি। তাই সে তার অভিভাবক বৃদ্ধ কর্ণধারের কাছে বিষয়টা সম্পর্কে জানতে চাইলো। কর্ণধার তাকে পুরো বিষয়টা তথা মণ্ডমূর্তি পূজার কারণ বুঝিয়ে বলল। তিনি তখন গাজী আর দক্ষিণ রায়ের মধ্যকার লড়াইয়ের কারণটিকেই বারামূর্তি পূজার কারণ বলে উল্লেখ করেন।

প্রসঙ্গত দক্ষিণ রায়কে আগে যেখানে দেবতাদের আশীর্বাদপ্রাপ্ত মানুষ হিসাবে দেখানো হয়েছে, অন্যত্র তাকে দেখানো হয়েছে পৌরাণিক দেবতারূপে। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ রায়ের একটি ভাইয়েরও সন্ধান পাওয়া যায়, যার নাম বলা হয়েছে কালু রায়। যেখানে আগের গল্পটিতে কালু ছিল বড়খাঁ গাজীর ভাইয়ের নাম। এমনকি গাজীকে নিয়ে প্রচলিত কাহিনিগুলোতে কালুর উপস্থিতি দেখা যায় গাজীর ভাই হিসাবে। শুধু তাই নয় এমনও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, দক্ষিণ রায় ও কালুরায় হলো শিবের কামজপুত্র ভব ও শর্ব। দক্ষিণ রায়কে গণেশের আদিরূপ বলেও অনেকে বিশ্বাস করে থাকেন। মুণ্ডপ্রতীক বা বারামূর্তির বিষয়ে বলা হয়, ওটা আসলে গণেশের ছিন্ন মস্তক। বলা হয়, গণেশের মস্তক ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দক্ষিণ অঞ্চলে পড়েছিল।

তাই দক্ষিণ রায়কে দেবতা হিসাবে গণ্য করা হয় এবং তার বারামূর্তি পূজা করা হয় প্রতীকী হিসাবে।

বারামূর্তি পূজা নিয়ে আরেকটি জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। সেই গল্পে বলা হয়েছে, দক্ষিণ রায় বারা রূপে সমুদ্রের মাঝে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তখন সমুদ্রের নাবিকরা সেই বারা পানি থেকে ডাঙায় তুলে নিয়ে আসেন এবং দক্ষিণ রায়রূপে পূজা আরম্ভ করেন। সুন্দরবনের জেলেদের কাছেও দক্ষিণ রায় পূজনীয়। এ সম্পর্কে অন্যত্র ধারণা পাওয়া যায় :

আমি তো জঙ্গল রাজা দক্ষিণ ঈশ্বর।
সেবক বটে হয়ে তো ধীবর।।

দক্ষিণ রায়ের উদ্দেশ্যে পাকা বা ইটের তৈরি মন্দিরের দেখা মেলে না বললেই চলে, পরিবর্তে খড় বা গোলপাতার ছাওয়া মাটির থানেই তাকে বেশির ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান দেখা যায়। তবে ব্যাঘ্রদেবতা বলে বিশেষ খ্যাতি থাকলেও স্থান বিশেষে দক্ষিণ রায়ের পূজার অনুষ্ঠান ও ভক্তদের তার প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

সুপ্রতিষ্ঠিত পল্লীতে মাটি দিয়ে দক্ষিণ রায়ের বিগ্রহ তৈরি করে পূজা করতে দেখা যায়। ভক্তদের কাছে তিনি ব্যাঘ্রদেবতা হিসাবে সর্বাধিক পরিচিত হলেও এসব জায়গায় নানাবিধ রোগ থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে তার পূজা করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বর্ণব্রাহ্মণেরা তার পূজার পৌরোহিত্য করে থাকে এবং এক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় দেবতার বিধান অনুসরণ করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরাহিতরা দক্ষিণ রায়কে শিবপুত্র গণেশ বলেও প্রচার করে থাকেন। কোথাও কোথাও পুরোহিতরা গণেশ ধ্যান মন্ত্রের সাহায্য দক্ষিণ রায়ের পূজা করে থাকেন। কিন্তু যে কথা না বললেই নয়, গণেশের সাথে দক্ষিণ রায়ের কোনো সাদৃশ্য নেই। গণেশ খর্বাকৃতির, কিন্তু দক্ষিণ রায়ের যে বিগ্রহ আমরা পল্লী অঞ্চলে দেখতে পাই, সেটি থেকে ধারণা পাওয়া যে দক্ষিণ রায় খর্বাকৃতির নয় বরং বিশালদেহী। ব্রাহ্মণরা আরো প্রচার করে থাকেন, দক্ষিণ রায় রূপটি নাকি গণেশের আদিরূপ। অবশ্য এমন ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় মধ্যযুগে রচিত রায়মঙ্গল কাব্যে। রায়মঙ্গলে আছে :

আশ্চম্বিতে উচাটিল গণেশের মাথা,
দক্ষিণে পড়িয়া সেই হইলো দেবতা।

কিন্তু এসব কথা কোনো শাস্ত্রেই উল্লেখ নেই। যদিও শাস্ত্রীয়ভাবে কিছু কিছু পল্লীতে তার পূজা সম্পন্ন হয়ে থাকে, তা সত্ত্বেও তিনি কারোর গৃহদেবতা

হতে পারেননি। তাই তিনি যে কোনো শাস্ত্রীয় দেবতা নন, বরং লৌকিক দেবতা সে বিষয়ে কোনোপ্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। নিয়মিত তার পূজা না হলেও শনি ও মঙ্গলবারে বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। পূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় দ্বিপ্রহরে। পূজার সময় বাদ্যকীর্তনও হয়। দেবতার উদ্দেশ্যে ছাগল বলী দিতে দেখা গেলেও অধিকাংশক্ষেত্রে নিরামিষ নৈবেদ্যের প্রচলন রয়েছে।

দক্ষিণ রায়ের উপাসকমূলত সুন্দরবন থেকে মোম-মধু, মাছ ও কাঠ সংগ্রহকারী মউলে, জেলে, বাউলেরা। তাদের বিশ্বাস মধু, মোম, মাছ বা কাঠ সংগ্রহের ক্ষেত্রে দক্ষিণ রায়ের আশীর্বাদ প্রয়োজন। অনেক জায়গায় দক্ষিণ রায়ের পূজায় ব্যবহৃত হয় এমন দু-একটি মন্ত্রেরও সন্ধান মেলে। এমনই একটি মন্ত্র হলো :

চন্দ্রবদন চন্দ্রকায়
শার্দূল বাহন দক্ষিণ রায়
ঢাল তলোয়ার টাঙ্গি হস্তে
দক্ষিণ রায় নমোহস্তুতে।।

ওঁ দম্ দম্ দম্–এটি হলো পূজার বীজমন্ত্র। গহীন অরণ্য মাঝে এই পূজা আয়োজনের ক্ষেত্রে অরণ্যের মধ্যিখানের খানিকটা জায়গা পরিষ্কার তাতে ছোটো একটা বেদী তৈরি করা হয়। বেদীর ওপর স্থাপন করা হয় ঘট। চারদিকে জ্বালানো হয় মশাল। পূজায় পৌরোহিত্য করে নিম্নবর্ণের হিন্দু, যাদেরকে দোয়াশি পুরুতও বলা হয়ে থাকে। ব্যবহৃত হয় ঢাক, ঢোল ও কাঁসির মতো দেশীয় বাদ্যযন্ত্র। পশুপাখি বলী এবং নৈবেদ্য হিসাবে মদ, ভাং, গাঁজা, মাংস দেওয়া আবশ্যক।

দক্ষিণ রায় চরিত্রটি এত বৈচিত্র্যময় হওয়ার কারণ হিন্দু-মুসলিম উভয়ের ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্য। উভয়ই নিজেদের মতো করে তাকে সাজিয়ে নিয়েছেন। তাই কখনো তিনি গাজীর সঙ্গীদের একজন হয়েছে, কখনো গাজীর মধ্যস্থতায় বনবিবির সাথে মানুষরূপী নরখাদক দক্ষিণ রায়ের বিবাদের সমাধান হয়েছে। আবার কখনো সরাসরি দক্ষিণ রায় নিজেই লিপ্ত হয়েছে যুদ্ধে নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশে। কোথাও তিনি হিংস্র নরখাদক, আবার কোথাও ভক্তের রক্ষাকর্তা। আর এসবের পেছনে উভয় ধর্মের কবিদের সংস্পর্শের আসার বিষটিকেও ছোটো করে দেখা যায় না।

কর্ণফুলী নদীর আখ্যান

কর্ণফুলী নদীর উৎপত্তি আসামের লুসাই পাহাড় থেকে। নদীটি পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মিলিত হয়েছে দেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগরের সাথে। কর্ণফুলী নদীটিকে কেন্দ্র করে প্রচলিত রয়েছে একটি আখ্যান।

কথিত আছে, অতীতকালের কোনো একসময় এটি ছিল খুবই ছোটো একটি নদী, যার দু'ধারে ছিল দুটি দেশ–একটির নাম গরল, অন্যটির নাম আজ অজ্ঞাত। দেশ দুটির রাজা ও প্রজাদেরদের জীবনযাত্রার ধরন, সংস্কৃতি, আচারপ্রণালি, রীতিনীতি, আইন, মোটকথা সবই ছিল একেবারেই আলাদা। কিন্তু একটি বিষয়ে উভয় দেশের অধিবাসীদের ছিল মিল–উভয়েই একে অপরের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতো। এই মিলের কারণটাই তাদের মধ্যকার সবচেয়ে বড়ো প্রাচীর হয়ে দেখা দিয়েছিল। দেশ দুটির মধ্যে যে সবসময় বিষমভাব বিরাজ করতো আশা করি সেটি আর আলাদা করে বলে দিতে হবে না। দেশ দুটির সর্বস্তরে এমন ধারণা বিদ্যমান থাকায় তারা একে অপরকে খুবই হেয়জ্ঞান করে চলতো। তাদের মধ্যে কোনো প্রকার সম্বন্ধ স্থাপিতও হতো না, এমনকি বৈবাহিক সম্পর্কও নয়।

জনশ্রুতি রয়েছে, গরল দেশের রাজার ছিল এক অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যা। কন্যাটির যখন বিবাহের বয়স হলো, তখন বিভিন্ন দেশ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগলো, কিন্তু কোথাও রাজকন্যার যোগ্য পাত্র পাওয়া গেল না। এদিকে সময় তার আপন গতিতে বয়ে চলতে থাকে। পেড়িয়ে যেতে থাকে রাজকন্যার বিয়ের বয়স। প্রায় একই সমস্যা গরল দেশটির পাশের দেশেও। ওদের দেশের রাজপুত্রের বিবাহের বয়স পেড়িয়ে যাচ্ছে যাচ্ছে করছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

একদিন রাজকুমার যখন নদীতে নৌবিহারে বের হলেন, ঠিক তখন নদীর অপরপারে সখী বেষ্ঠিত হয়ে গরল দেশের রাজকন্যা নদীর ঘাটে এলো গোসল করতে। এমতাবস্থায় রাজপুত্র ও রাজকন্যার মধ্যে বিনিময় হলো দৃষ্টি। প্রথম দেখাতেই দুজনেই দুজনার প্রতি ভীষণ আকৃষ্ট হয়ে পড়লো। তাদের মধ্যে কোনোরকম বাক্য বিনিময় না হলেও, চোখে চোখে কথা হলো

ঠিকই। পরের দিনও একই সময়ে রাজপুত্র নৌবিহারে বের হলেন। রাজকুমারীও নদীর ঘাটে এলো তার সখীদেরকে নিয়ে। দুজনেই একে অপরের প্রতি প্রেম দেখতে পেলো। বাড়ি ফিরে গিয়ে রাজপুত্র পিতাকে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গরল দেশে দূত পাঠাতে বললেন, কিন্তু রাজপুত্রের প্রস্তাবে রাজী হলো না রাজা, উল্টো ক্রোধান্বিত হলেন এমন স্পর্ধা দেখে। হবেনই বা না কেন, নিচু জাতের দেশ গরল রাজের কন্যার সাথে তার পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে তারই দূত যাবে!—এ খবর ছড়িয়ে পড়লে তার সম্মান চিরতরে ধুলিস্মাৎ হয়ে যাবে। অবশ্য রাজপুত্রকে রাজা যে কম ভালোবাসেন তা কিন্তু নয়।

শেষমেশ রানির হস্তক্ষেপে রাজপুত্রের কথায় গরল দেশে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠাতে সম্মত হলেন রাজা। কিন্তু তাতে সমস্যা সমাধান হলো না। রাজার দূত গরলরাজের কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলে রাজা তাকে চরমভাবে অপমান করলো।

অপমানিত হয়ে গরলরাজ্য থেকে দূত যখন ফিরে এলো, তার মুখ থেকে সবটা শুনে ক্রোধে ফেটে পড়লো রাজা। সিদ্ধান্ত নিলো গরলরাজ্য আক্রমণের। সেই লক্ষ্যে সৈন্য সমাবেশও ঘটালেন।

এদিকে যুদ্ধের প্রস্তুতির খবর গরলরাজের কানে পৌঁছতেই সম্বিৎ হলো তার। তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে অনাকাঙ্ক্ষিত যে যুদ্ধ আজ দুয়ারে কড়া নাড়ছে তা শুধুমাত্র যে রাজ্যেরই ক্ষতি করবে তা কিন্তু নয়, বরং মারা যাবে অনেক নিরীহ প্রজা। শেষ পর্যন্ত গরল রাজের কন্যার বুদ্ধিতে যুদ্ধ রোধ করা গেল। দুই দেশের মধ্যে স্থাপিত হলো সম্প্রীতি। পুনরায় আবার বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠানো হলো গরলরাজের কাছে। এবার রাজা রাজী হলেও জুড়ে দিলেন শর্ত। বলা হলো, তার কন্যাকে বিয়ে করতে হলে বিয়ের পর রাজপুত্রকে এক বছরের জন্য গরলরাজ্যে বাস করতে হবে। এরপর চাইলে তারা যেখানে খুশি চলে যেতে পারে।

প্রিয় পুত্রের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে প্রস্তাবটি মেনে নিলেন রাজা। রাজপুত্র ও রাজকন্যার মধ্যে বিবাহ সুসম্পন্ন হলো। শর্তানুযায়ী রাজপুত্র তার শ্বশুরের রাজ্য গরল দেশে বসবাস শুরু করলো। সুখে শান্তিতেই দিন কাটছিল তাদের। কিন্তু একদিন রাজকন্যা সখীদের নিয়ে যখন নদীতে গোসল করতে গেলেন, তখনই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। নদীতে নেমে রাজকন্যা পানিতে ডুব দেওয়ার পর আর উঠে এলেন না। সখীরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো রাজকন্যার জন্য। জলে খোঁজাখুঁজিও করলো অনেক, কিন্তু কোনো সুরাহা করতে পারলো না তারা। রাজকন্যা যেন হঠাৎ করে পানিতে মিশে গেছে।

রাজকন্যার সখীরা প্রাসাদের ফিরে এসে সবটা জানালে লোক নিয়ে রাজা ছুটে যায় নদীর ধারে। তন্ন তন্ন করে রাজকন্যার খুঁজাখুঁজি চলল, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হলো না। রিক্ত হস্তে তাদেরকে প্রাসাদে ফিরে আসতে হলো। রাজকন্যা এভাবে হারিয়ে যাওয়ায় সমগ্র রাজ্যজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এলো।

রাজ্যকন্যাকে হারিয়ে রাজপুত্রের পাগলপ্রায় অবস্থা। রাতদিন নদীর ঘাটেই বসে কাটিয়ে দেয়। একদণ্ডও ঘাট থেকে সরে না। নাওয়া-খাওয়া সবই ভুলে গেল। এভাবেই কেটে গেল তিনদিন। চতুর্থ দিনে রাজপুত্রের চোখ দুটোতে ঘুম এসে ভর করলো। অদ্ভুতভাবে সে ঘুমিয়ে পড়লো নদীর ঘাটেই। আর তখনই পানির নিচ থেকে ভেজা কাপড় সমেত আবির্ভূত হলো রাজকন্যা। রাজপুত্রকে ঘুম থেকে জাগালো সে।

এদিকে জেগে ওঠার পর রাজপুত্র দেখলো তার সামনে ভেজা কাপড়ে রাজকন্যা দাঁড়িয়ে আছে। রাজকন্যাকে দেখে রাজপুত্রের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু খানিক বাদেই তার খেয়াল হলো রাজকন্যা কেবল নির্বাকভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখে কিছুই বলছে না। রাজপুত্র মনে করলো রাজকন্যার বুঝি স্মৃতিলোপ পেয়েছে। যাই হোক, রাজকন্যাকে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলো সে। রাজা তার কন্যাকে ফিরে পেয়ে আনন্দে অশ্রুপাত করলো। সমগ্র রাজ্য মেতে উঠলো রাজকন্যার ফিরে আসার আনন্দে। সবাই ভুলে গেল রাজকন্যা এই তিনদিন কোথায় ছিল।

কথিত আছে, হারিয়ে যাওয়ার দিন রাজকন্যা যখন নদীতে গোসল করতে নামে, তখন সেদিক দিয়ে সমুদ্রের এক জলপরী যাচ্ছিল। পরমাসুন্দরী রাজকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার সাথে বন্ধুত্ব পাতানোর খুব ইচ্ছা হয়েছিল সেই জলপরী। তাই রাজকন্যা জলে ডুব দিলে জলপরী তাকে নিজের বাহনে তুলে নিয়ে সাগরে চলে যায়। নিখোঁজ হওয়ার তিনদিন রাজকন্যা সেই জলপরীর সাথে তার প্রাসাদেই ছিল। দুইজনের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হলে গরল দেশের রাজকন্যার অনুরোধে জলপরী তাকে পুনরায় আবার ঘাটে পৌঁছে দেয়। তবে জলপরী চলে যাওয়ার সময় রাজকন্যাকে বার বার সাবধান করে দিয়ে যায় সে যেন কাউকে এই তিনদিনের বিষয়ে কিচ্ছুটি না বলে। রাজকন্যা যদি কারোর কাছে এ সম্বন্ধে কিচ্ছুটি বলে তাহলে তার ঘোর অনিষ্ট হবে। কেউ তাকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। রাজকন্যাও জলপরীকে অভয় দিয়ে কাউকে কিছু না বলার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। চলে যাওয়ার সময় জলপরীটি রাজকন্যার হাতে দুটো প্রবাল তুলে দেয় বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসাবে এবং বলে, এই প্রবাল দুটি একসাথে ঘষা দিলেই জলপরী এসে

হাজির হবে। অন্যদিকে বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসাবে জলপরীকে রাজকন্যা তার কানে থাকা বহু মূল্যবান দুলজোড়া উপহার দেয়। জলপরীও তা সাদরে গ্রহণ করে। চলে যাওয়ার আগে জলপরীই রাজকন্যার কাপড় পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিয়ে যায়, যাতে কারোর মনে কোনো প্রকার সন্দেহের জন্ম না নেয়। হলোও তাই। পুরো বিষয়টাই কারোর মাথায় রইলো না।

ধীরে ধীরে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে এলো। রাজপুত্র একদিন খেয়াল করলো, বিয়ের সময় রাজকন্যাকে সে যে কানের দুল উপহার দিয়েছিল সেগুলো আর রাজকন্যার কানে নেই। রাজকন্যার কাছে দুল দুটো কোথায় আছে জানতে চাওয়া হলে সে জানালো কর্ণফুল জোড়া নদীর পানিতে হারিয়ে গেছে। নদীর পানিতে রাজকন্যার কর্ণফুল খসে পড়ার কারণে রাজপুত্র নদীটির নামকরণ করলো কর্ণফুলী।

আরো কিছুদিন পর রাজপুত্র খেয়াল করলো রাজকন্যা প্রায়ই কাউকে কিছু না বলে রাতের অন্ধকারে কোথায় যেন যায়। বিষয়টা রাজপুত্রের মনে সন্দেহের জন্ম দিলো। একদিন রাজপুত্র তার স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলো ডুবে যাওয়ার পর সে ঐ তিনদিন কোথায় ছিল আর তিনদিন পর এসেছিলই বা কোথা থেকে? আর রাতের অন্ধকারে কোথায়ই বা যায়? কিন্তু রাজকন্যা তার প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দেয় না। এড়িয়ে যায়। এদিকে রাজপুত্রও নাছোড়বান্দা, কোনোভাবেই যেন তাকে পাশ কাটানো যায় না। শেষমেশ রাজকন্যা বিরক্ত হয়ে বলল, "এই প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারবো না, এতে আপনারই ক্ষতি হবে। আমাকে বাধ্য করবে না।"

কিন্তু কে শোনে রাজকন্যার কথা। উপরন্তু এভাবে হঠাৎ হঠাৎ প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে রাজপুত্রের মনের ভেতর রাজকন্যার চরিত্রের ব্যাপারে সন্দেহের জন্ম নিলো। বার বার সে রাজকন্যাকে একই প্রশ্ন করে গেল। এক পর্যায়ে রাজকন্যার চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তুলতে ছাড়লো না। রাজকন্যা দেখলো পুরো ব্যাপারটা প্রতিনিয়ত খারাপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সত্য প্রকাশ না করলে তার চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। রাজপুত্রের সাথেও তার সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে। বিষয়টা রাজবাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের চোখ এড়ালো না। উপায় না পেয়ে রাজকন্যা মুখ খুলল। রাজপুত্রকে সবটা খুলে বলল।

সবকথা শোনার পর রাজকন্যার চরিত্র নিয়ে রাজপুত্রের মনের সন্দেহ আরো দৃঢ় হলো। রাজপুত্র আরো জানতে চায়। রাজকন্যার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকে। তাকে এই বলে হুমকি দেয় যে যদি সবটা খুলে না বলে তাহলে রাজকন্যাকে ফেলে সে নিজের দেশে ফিরে যাবে। তখন পথ

না পেয়ে রাজপুত্রের কাছে জলপরীর সাথে তার বন্ধুত্ব হওয়ার বিষয়টিও খুলে বলে। সেই সাথে জলপরীর দেওয়া উপহার দুটোও দেখায়। রাজপুত্রকে জানায় কী করলে জলপরী হাজির হবে। তারপরেও রাজপুত্রের মনের ভেতরকার সন্দেহ দূর হয় না। সে ধারণা করতে থাকে রাজকন্যা বুঝি অন্য কারোর সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়েছে। আর সেই সম্পর্কের কথা ঢাকতেই বুঝি বানিয়ে বানিয়ে এসব গালগল্প বলে যাচ্ছে। তাই রাজপুত্র মনে মনে একটা ফন্দি আটলো। রাজকন্যার ওপর নজর রাখবে। যখন সে রাতের অন্ধকারে প্রাসাদ থেকে বের হবে তখন চুপি চুপি তার পিছু নেবে। যেই ভাবা, সেই কাজ।

এদিকে রাজকন্যা প্রতিদিন কাউকে কিছু না বলে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যেত আসলে তার সখী জলপরীর সাথে দেখা করতে। যা হোক, সেদিনও ব্যতিক্রম হলো না। রাজকন্যা যখন জলপরীর সাথে দেখা করার জন্য প্রাসাদ থেকে বের হলো, তখন আড়াল থেকে তার ওপর নজর রাখা রাজকুমারও চুপিচুপি অনুসরণ করলো। রাজকন্যা কর্ণফুলী নদী তীরে উপস্থিল হলো। রাজপুত্রও তার পিছু পিছু উপস্থিত হলো নদী তীরে। হাতেনাতে রাজকন্যাকে ধরবে বলে ঝোপের আড়ালে অপেক্ষা করলো কী ঘটে দেখার জন্য।

রাজকন্যা নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে প্রবাল দুটো ঘষলো, এর কিছুক্ষণ পরেই পানির নিচ থেকে উঠে এলো এক অনিন্দ্য সুন্দরী জলপরী। রাজকন্যা ও জলপরী একে অপরকে আলিঙ্গন করলো। দুজনে নদীর ঘাটে বসে গল্প করলো বেশ কিছুক্ষণ।

এদিকে চাঁদের মিষ্টি আলোয় জলপরীর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল রাজপুত্র। নিজের স্ত্রীর কথা ভুলে গেল সে। যে-কোনোভাবে জলপরীকে তার চাই। বিদায়ক্ষণ যখন উপস্থিত হলে সখীদ্বয় একে অপরকে আলিঙ্গন করে সেদিনে বিদায় নিলো। আড়াল থেকেই সবটা দেখলো রাজকুমার। তার মনের মধ্যে কুমতলব জন্মালো। মনে মনে ঠিক করলো যে-কোনোভাবেই হোক না কেন, প্রবাল দুটো রাজকুমারীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে। প্রয়োজনে রাজকন্যাকে সে হত্যা করবে।

রাজকন্যা প্রাসাদে ফিরে আসার পর রাজপুত্র তাকে প্রবাল দুটি দিয়ে দিতে বলল। কিন্তু রাজকন্যা তাতে রাজী হয় না। সে বার বার অমঙ্গলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাবধান করে দেয়। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয় না। রাজপুত্র তাকে ফেলে রেখে নিজ রাজ্যে ফিরে যাওয়ার হুমকি দেয় পুনর্বার, কিন্তু তাতেও রাজকন্যা নিজ সিদ্ধান্ত বদলায় না। সে জানায় বেঁচে

থাকতে সে কখনোই এমন কিছু করবে না যাতে তার স্বামীর অমঙ্গল হয়। দুজনের মধ্যে ভীষণ কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এক পর্যায়ে রাজপুত্র নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়ে কোমরে থাকা কোষাবদ্ধ তলোয়ারটি তুলে নেয় এবং এক কোপে ধড় থেকে রাজকুমারীর মস্তকটাকে আলাদা করে ফেলে।

এত বড়ো অপকর্ম করার পড়েও লম্পট রাজপুত্রের তখনো হুশ ফেরে না। ফিরবেই বা কী করে, সে তো নিজের লালসার দ্বারা অন্ধ হয়ে আছে। যাই হোক, প্রবাল দুটো নিয়ে ছুটে যায় নদী তীরে। নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে একইভাবে ঘষতে থাকে। একটু বাদেই নদীর শান্ত জল আন্দোলিত হতে দেখা যায়। জলের তলা থেকে উঠে আসে জলপরী। কিন্তু জলপরী কিছু বুঝে ওঠার আগে রাজপুত্র তাকে হরণ করে নিজ রাজ্যের দিকে ঘোড়া ছুটায়। কিন্তু রাজপুত্র বুঝতেই পারে না সে নিজের সাথে করে কী অভিশাপ নিয়ে যাচ্ছে তার রাজ্যের জন্য।

ঘোড়া ছুটিয়ে রাজপুত্র যখন নিজ রাজ্যের রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে হাজির হলো, তখন প্রায় মধ্যরাত। চারপাশ একেবারে শুনশান। সামান্য দূরেই রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকে মশাল জ্বলছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রাজপুত্র। জলপরীও এতক্ষণ কোনো সাড়া দিচ্ছিল না, যেন সে একটা কাঠের পুতুলে পরিণত হয়েছে।

যা হোক, এতক্ষণে জলপরীর দিকে নজর দেওয়ার সময় পেল। জলপরীর চেহার দিকে তাকাতেই এক অদ্ভুত অভিব্যক্তি রাজপুত্রের চোখে ধরা দিলো। তৎক্ষণাৎ শুনতে পেলো নদীর পানি যেভাবে কুলকুল ধ্বনি করে বয়ে চলে, তেমনি পানি বয়ে চলার শব্দ পেছন থেকে ভেসে আসছে। অবাক হলো রাজপুত্র! রাজপ্রাসাদের সীমানার কাছাকাছি নদীর পানির শব্দ কোনোভাবেই আসার কথা নয়। পেছন ফিরে তাকালে রাজপুত্র। দেখলো সর্বত্র কেবল পানি আর পানি। সেই পানিতে প্রতিফলিত হচ্ছে চাঁদের আলো। ভড়কে গেল রাজপুত্র। স্মরণে এলো রাজকুমারীর সাবধান বাণী। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। রাজপুত্রের পাপের জন্য তার গোটা রাজ্য তলিয়ে গেল কর্ণফুলী নদীর পানির নিচে।

কালক্রমে গরলরাজ্যটিও একদিন হারিয়ে গেল চিরতরের মতো। একসময় কর্ণফুলী নদীটি আবার ভরাট হতে শুরু করলো। নতুন করে গড়ে উঠতে থাকে বসতি। জনশ্রুতি রয়েছে, পটিয়া থানার অন্তগত কেলিশহর গ্রামটিই নাকি তৎকালীন গরলরাজ্যের শহর ছিল আর ধলঘাট নামক গ্রামটিতে ছিল রাজ্যের ঘাট।

বৌ ঠাকুরানির হাট

যশোহর রাজবাড়িতে আজ রাজকর্মচারীরা ভারি ব্যস্ত। বহুদিন পর জামাতা আসছে তার শ্বশুরবাড়ি। চন্দ্রদ্বীপের তরুণ রাজা বীর রামচন্দ্র। বাংলার বারো ভূঁইয়াদের একজন এই রামচন্দ্র। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ যে যশোহর রাজবংশের তুলনায় নবীন ও কম মহিমান্বিত তা রাজ মহীষির সাথে যশোহর পতি আরেক ভূঁইয়া রাজা প্রতাপাদিত্যের মতের কোনো অমিল নেই। তথাপি জামাই বলে কথা, তাই আয়োজনের কমতি নেই রাজবাড়িতে। ফুলে ফুলে সজ্জিত হয়েছে গোটা বাড়ি। খাবারদাবারের বিস্তর আয়োজন রসুইঘরে। ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজার সাথে একমাত্র কন্যার বিয়ে দেয়ার পেছনে প্রতাপাদিত্যের স্বার্থ জড়িয়ে ছিল ষোলো আনা। মুঘলদের সাথে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ জয়ে রামচন্দ্রের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। এছাড়া যশোহরকে নদীপথের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চন্দ্রদ্বীপ হাতে থাকা প্রয়োজন।

রাজধানী মাধবপাশা থেকে রওনা দিয়েছে রাজা রামচন্দ্রের ময়ূরপঙ্খি বজরা। রাজধানীর দু'দিক দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা নদী। বজরার পাটাতনে বসে চিন্তিত মনে দুপাশের গ্রাম্য সৌন্দর্য অবলোকন করছেন যশোহরের রাজকন্যা বিন্দুমতী। তার চিন্তার কারণ হঠাৎ পিতার এই নিমন্ত্রণ। পিতাকে যতটুকু চেনে তাতে সে খুব ভালো করেই বোঝে যে স্বার্থ ছাড়া তিনি কিছুই করেন না, তবু কী নিজ জামাতার সাথে কোনো চলচাতুরী করবেন তিনি? অমঙ্গল চিন্তায় বিন্দুমতী কাছে শায়িত রামচন্দ্রের দিকে তাকায়। নিজ স্বামীকে ভীষণ ভালোবাসে বিভা।

যশোহর রাজবাড়ি একদিকে যেমন চলছে জামাইকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিপুল আয়োজন, তেমনি অন্যদিকে মন্ত্রণাগৃহে চলছে এক গোপন সভা। রাজা প্রতাপাদিত্য তার গুটিকয়েক বিশ্বস্তজনকে নিয়ে এই সভা। হ্যাঁ, জামাইকে নিমন্ত্রণের মধ্যে প্রতাপাদিত্যের স্বার্থ অবশ্যই জড়িয়ে আছে। পরগনা চন্দ্রদ্বীপ কুক্ষিগত করার স্বার্থ। কতকাল ধরে রাজা

প্রতাপাদিত্যে স্বপ্নে বিভোর সমগ্র বাংলার মসনদ নিজের করতলে আনা। কিন্তু সবার আগে চাই নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আর তাই তার প্রয়োজন চন্দ্রদ্বীপ। কোনো প্রকার হানাহানি যুদ্ধ পরিহার করে গুপ্তহত্যার চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে! মন্ত্রণাগৃহে সিদ্ধান্ত হলো আগামীকাল হবে রাজা রামচন্দ্রের শেষ দিন। বাইরে ঢাকের শব্দে মন্ত্রণাগৃহ থেকে বের হয়ে আসেন প্রতাপাদিত্যে। বিনয়ে গদগদ হয়ে কন্যা ও জামাতাকে সাদরে প্রাসাদে নিয়ে আসেন তিনি। বিন্দুমতীর কাছে সবকিছু অতিরঞ্জিত লাগে। পিতার চোখে দেখতে পান কোনো কিছু হাসিল করার অগ্রীম উল্লাস, চকচকে লোভী চোখ দেখে শিউরে উঠে সে। পিতার প্রতি ঘৃণায় কুঁকড়ে যায় তার মন।

গভীর রাত। চারদিক নিস্তব্ধ। রাতের আঁধার আজ গিলে ফেলেছে চারদিক। শুধু প্রতাপাদিত্যের রাজপ্রাসাদে দেখা যায় মশালের আলো। কখনো ভেসে আসে বহুদূর থেকে মশালচির অস্পষ্ট হাঁক। রাজপ্রাসাদের একটি গবাক্ষ থেকে ক্ষীণ একটি আলোর ধারা লক্ষ করা যায়। রাজকুমারী বিন্দুমতীর কামরা ওটি। ধাইমার কাছে পিতার নৃশংস পরিকল্পনার কথা শুনে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে বিন্দু। একজন পিতা কতটা নিষ্ঠুর ও লোভী হলে কন্যাকে বিধবা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে! একটু ধাতস্থ হতেই বিন্দুমতী নিজের কর্তব্য ঠিক করে নেয়। এ প্রাসাদে আর একজনই আছে যে ওকে সাহায্য করতে পারে; রাজকুমার উদয়াদিত্য।

যশোহর রাজবাড়িতে একজনই আছেন যিনি রাজা প্রতাপাদিত্যের ঘৃণিত কাজের প্রতিবাদ করেন। এজন্য তাকে পিতার গুঞ্জনা সইতে হয় প্রচুর। তবু মন্দের ভালো বৃদ্ধ রাজা বসন্ত রায় উদয়াদিত্যকে অত্যাধিক স্নেহ করেন। একমাত্র ভগ্নির কাছে পিতার এহেন পরিকল্পনা শুনে উদয়াদিত্য ক্ষুব্ধ হলেন। শীঘ্রই ঠিক করা হলো রামচন্দ্রকে প্রাসাদের বাইরে নিয়ে যাবে কুমার উদয়াদিত্য। বিন্দুমতীর কক্ষের গবাক্ষ দিয়ে বেনারসি শাড়ি দিয়ে বানানো দড়ি বেয়ে নিচে নামে রামচন্দ্র। কুমার উদয়াদিত্যে আর রাতে অন্ধকারের সাহায্যে নিজ রাজ্যের পথে যাত্রা করে রাজা রামচন্দ্র। সকাল হতে রাজা প্রতাপাদিত্যে বুঝতে পারেন বিফল হয়েছে সব আয়োজন। হিংস্র শ্বাপদের মতো আক্রোশে ফেটে পড়লেন তিনি। নিজ সন্তান কুমার উদয়াদিত্যের জায়গা হলো কারাগারে। উদয়াদিত্যকে কারাভোগের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন বসন্ত রায়। গোপনে কৌশলে উদয়াদিত্যকে রায়পুরে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। প্রতাপাদিত্য রায়পুরে সৈন্য পাঠিয়ে হত্যা করালেন বসন্ত রায়কে। উদয়াদিত্যের জায়গা হলো আবার সেই অন্ধকার কারাগারে।

আজ থেকে পাঁচশ বছর আগেকার কথা। বর্তমান খুলনা ও বরিশালের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল আমাদের গল্পের চন্দ্রদ্বীপ। বর্তমান বরিশাল জেলার একটি জায়গা হলো বৌ-ঠাকুরানির হাট। কালের গহ্বরে পুরোনো সব হারিয়ে যায়। এই গহ্বরে কবে যে হারিয়ে ধূলিধূসরিত হয়ে গেছে বৌ-ঠাকুরানির হাট তা কেউ জানে। হারিয়েছে এর জৌলুস। চারদিকে শুধু ধূধু বিস্তর প্রান্তর। 'বৌ-ঠাকুরানির হাট' নামটি পাঠক মাত্র পরিচিত মনে হতেই পারে। বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা মোট ১৩টি উপন্যাস। এরমধ্যে দুটি ছিল ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই 'বৌ-ঠাকুরানির হাট (১৮৮৩)' হচ্ছে ঐতিহাসিক উপন্যাস দুটির একটি। বৌ-ঠাকুরানির হাট শুধু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেই বেঁচে নেই, বেঁচে আছে কিংবদন্তীতেও। কীভাবে এর নাম হলো বৌ-ঠাকুরানির হাট এই আমাদের গল্পের উপজীব্য বিষয়।

দিন যায় রাত যায়, ফুল ঝরে আবার নতুন কুঁড়ি জাগে। যশোহর রাজবাড়ির ফুলবাগানে নানা ফুল হাসে, কেবল একটি ফুল বাদে; বিন্দুমতী। বিন্দুমতীর মনে সুখ নাই, মুখে হাসি ফোটে না। সেই যে রামচন্দ্র গিয়েছে তার আর খবর নেই। বিন্দুমতী বোঝে তার পিতা যে কাণ্ড ঘটিয়েছে এরপর রামচন্দ্রের সাথে তার মিলন অসম্ভব। প্রাসাদে থাকার পরেও সে একপ্রকার গৃহবন্দী। রামচন্দ্র কি পারতো না নিজের বিয়ে করা বৌকে নিয়ে যেতে! তবু রামচন্দ্রকে দোষ দিতে মন সায় দেয় না বিন্দুর। অন্যদিকে রাজা প্রতাপাদিত্য নিজেও সুখে নেই, নিজের রক্তের কারাবাস তাকে কুঁড়েকুঁড়ে খায়, চোখ বন্ধ করলে পিতৃতুল্য বসন্ত রায় ভেসে উঠেন। এ যন্ত্রণা যে যুদ্ধে পরাজয়ের থেকেও ভয়ঙ্কর। এমন অবস্থায় একদিন গুপ্তচর খবর আনে বিশাল মুঘল বাহিনী নিয়ে সেনাপতি এনায়েত খাঁ এগিয়ে আসছে যশোহরের দিকে। যুদ্ধ দামামায় চারদিক প্রকম্পিত হয়ে উঠে। রাজসৈন্য যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হতে থাকে, কামারের কাজের বিরতি নেই দিনরাত অস্ত্র তৈরি চলছে। রাজা প্রতাপাদিত্য পূর্বের বিজয়ে আত্মতৃপ্ত। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন পূর্বের যুদ্ধে তার সাথে ছিল চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য, কিন্তু এবার তিনি সম্পূর্ণ একা, তাছাড়া এবার মুঘলরা দলেও ভারী। একদিন মুঘল সেনাপতি এনায়েত খাঁ পৌঁছুলো যশোহর। রাজা প্রতাপাদিত্যের কাছে দূত গেলো সংবাদ নিয়ে, যুদ্ধ না সন্ধি। রাজা প্রতাপাদিত্যে অবজ্ঞা ভরে বললেন, যুদ্ধ। হামলে পড়লো মুঘল সৈন্যদল। যুদ্ধে পরাজিত, বন্দি হয়ে নিহত হলেন প্রতাপাদিত্য। সেই সাথে ধূলিসাৎ হলো বাংলার মসনদ কুক্ষিগত করার বাসনা। কারাগার হতে মুক্তি পেলো কুমার উদয়াদিত্য।

মুঘল সম্রাটকে নিয়মিত কর প্রদানের অঙ্গীকারের মাধ্যমে অল্পদিন পর

রাজা হলেন উদয়াদিত্য। এত কিছু হয়ে গেল তবুও রামচন্দ্রের খবর নেই। সে যেন সব জেনেও জানে না। আশায় দিন গুণতে থাকে বিন্দুমতী। একমাত্র ভগ্নির কষ্ট যেন উদয়াদিত্যকে আঘাত করে। উদয়াদিত্য হুকুম দিলেন বজরা সাজানোর, তিনি নিজেই বোনকে নিয়ে যাবেন চন্দ্রদ্বীপে। যাত্রার দিন যত এগিয়ে আসে বিন্দুমতী ততই যেন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। পিতৃলয়ের ষড়যন্ত্র আর রামচন্দ্রের তার প্রতি উদাসীনতা তাকে স্বস্তি দেয় না এক মুহূর্ত।

অবশেষে যাত্রার দিন আসে। ডুরে পাড় শাড়ি, হাতে চুড়ি, পায়ে আলতা রাঙিয়ে পানসিতে বসে বিন্দুমতী। নিস্তরঙ্গ পানি কেটে পানসি এগিয়ে চলে গন্তব্যে। একসময় পানসি নোঙর করে নদীর এক অখ্যাত ঘাটে। আলতা রাঙা পায়ে দাসী পরিবৃত হয়ে এগিয়ে চলে বিন্দু। কতদিন পর দেখা মিলবে মনের মানুষের সাথে। কিন্তু একি! চারদিকে রঙের মেলা বসেছে। হাসিমুখে মানুষের দল রাজবাড়ির দিকে এগুচ্ছে। অমঙ্গল চিন্তায় বিন্দুমতীর বুক কেঁপে উঠে। পথিমধ্যে উদয়াদিত্য জানতে পারে আজ রামচন্দ্রের বিয়ে। খবর শুনে বিন্দুমতী চমকে উঠে। তবুও রুদ্ধ হয় না পথচলা আশায় বুক বেঁধে এগিয়ে চলে। হয়তো বা তাকে দেখে রামচন্দ্র মত বদলাবে। সেও চায় না বিন্দু, নাহয় দাসী হিসেবেই থাকবে আজীবন। একসময় পথ ফুরায়।

চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্যে চন্দ্রদ্বীপ রাজবাড়ি সেজে উঠেছে আজ। বেজে চলেছে শানাই। সাজবেই বা না কেন রাজার দ্বিতীয় বিয়ে বলে কথা! দ্বিতল মহলে দেখা মেলে রামচন্দ্রের। রাজা রামচন্দ্রের পায়ে পড়ে বলে মিনতি জানায়- 'বিয়ে করুন, আপত্তি করবো না, কিন্তু এই দাসীকে আপনার পায়ে একটু জায়গা দিন মহারাজ।'

রামায়ণে লঙ্কা জয়ের পর যখন সীতা রামের কাছে ফিরে এলো তখন যেমন রাম সীতাকে অস্বীকার করেছিল, ঠিক তেমনই আমাদের গল্পের রামচন্দ্রও অস্বীকার করলো বিন্দুমতীকে। যুগে যুগে যেন নারীর এমনই পরিণতি ঘটে। বিপদের দিনে পরম প্রাণের পত্নী, শ্যালক উদয়াদিত্যর কারাবাস কিছুই যেন স্পর্শ করে না অকৃতজ্ঞ রামচন্দ্রকে। প্রাণপ্রিয় পত্নীকে ফিরিয়ে দিতে একটুও মুখে বাঁধে না তার। স্বামীর কাছে প্রত্যাখ্যান সইতে পারে না রাজকুমারী বিন্দুমতী, টলতে টলতে বেরিয়ে আসে রাজবাড়ি থেকে। হাঁটতে থাকে ঘাট লক্ষ্য করে, পেছনে রাজবাড়িতে যেন শানাইয়ে বেজে উঠে করুণ কোনো সুর। কিন্তু ঘাটের কাছে এসেই জ্ঞান হারায় বিন্দুমতী, সে জ্ঞান আর কোনোদিন ফেরেনি। অভাগী বিন্দুমতীর মৃত্যু ঘটে এখানে। জায়গাটির নাম হয় 'বৌ-ঠাকুরানির হাট'। আজও এই এলাকার মানুষের মুখে মুখে ফেরে পতিপ্রেমের এই অভূতপূর্ব কিংবদন্তী।

বলু পীরের কেরামতি

ছুটি বিশ্বাস বলে, আল্লা কপালেতে ছিল,
একটা ছেলে দিলে বাবা পাগল কেন হলো,
ঐ কথা শুনে বলু নড়ি (লাঠি) হাতে নেয়,
নড়ি হাতে নিয়ে বলু গরু রাখতে যায়।
গরু রাখতে যায় বলু ব্যাদন বিলের মাঠে,
গরু রাখতে যেয়ে বলু মাঠের ধানও খাওয়ায়।
বকে চাষী বক বক রাহা নাহি মানে
বক বানাইয়া গরু বান্ধে গাছের মধ্যখানে,
বাড়ি গিয়ে বকাবকি ছুটি বিশ্বেস করে
মামাবাড়ি হাজরাখানায় বকনি শুনে মরে,
ছুটি বিশ্বাস বলে, আল্লা কপালেতে ছিল,
একটা ছেলে দিলে বাবা পাগল কেন হলো।
গরু রাখতে যায় বলু হাজরাখানার মাঠে
সারাদিন থাকে মাঠে মাঠেই সময় কাটে।
সাপেরা ফনি ধরে মাথা করে ছায়া
বলুর রোদে থাকা দেখে সাপের হয় গো মায়া।
আরো বহু ঘটনা ঘটে বলুর মামা বাড়ি,
রস জাল দেয় বলু নিজি হয়ে গো খড়ি,
খড়ির মতো জ্বলে বলু, রস হয়ে যায় গুড়
মামি দেখে অবাক হয় রে দেখে দেয় দৌড়।
পাড়া পড়শির দেখায় সেই আজব ঘটনা।
এমনি করে বলুর জীবন হয়গো রটনা,
বেগুন চারা নিয়ে বলু মাঠের ধারে যায়,
সেই চারায় হলো বেগুন আল্লা রাহে হয়।
বহিলাপুতা বট গাছে বলু পাতে চারো (মাছ ধরার চারা)
মাছে মাছে ভরে যায় সব লোকে মানে হারো।।

এটি চৌগাছার লোকগীতির একটি জনপ্রিয় ফোলই গান। বলু পীরে
অলৌকিক জীবনযাপন নিয়ে গ্রাম্য কবিদের রচিত এই গানটি এখনো মানু
গুনগুন করে গেয়ে থাকে। প্রায় ৪০০ বছরের বেশি সময় আগে চৌগাছা
যাত্রাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এই বলু পীর। স্থানীয়দের মতে বলু পী
উপমহাদেশে জন্মগ্রহণকারী অন্যতম শ্রেষ্ঠ আউলিয়াদের একজন, যার ছি
অলৌকিক ক্ষমতা। পিতা নাম ছুটি বিশ্বাস। আর মাতা আলতি বিবি
ছোটোবেলা থেকে বলু পীর ছিলেন কিছুটা পাগলাটে গোছের। অস্বাভাবি
সব কর্মকাণ্ড করে বেড়াতেন। একইসাথে ধারণ করতেন জেদি মনোভাব
অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে বেড়ানোর কারণে লোকে তাকে পাগল বলে
সম্বোধন করতো। অবশ্য পরবর্তীকালে তার কার্যকলাপের মধ্যে ক্ষ্যাপামো
বহু নজির পাওয়া যায়। এজন্য বলু পীর আধ্যাত্মিকতার খ্যাপা বাউল নামে
মানুষের কাছে পরিচিত।

বাল্যকাল থেকে তার অলৌকিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ক্রমে তা
বাড়ির উঠনে ভীড় বাড়তে থাকে। একসময় বিরক্ত হয়ে তিনি বাড়ি ছেড়ে
চলে যান। গোটা জীবনকালে তিনি বহুবার বহু জায়গায় আস্তানা গেঁড়েছেন
তার অবস্থান করা প্রতিটি জায়গায় একটি করে দরগাহ্ গড়ে উঠেছে
যেগুলোর অনেকগুলো এখনো বর্তমান আছে। শেষ পর্যন্ত মামার বাড়ি
হাজরাখানায় এসে তিনি মৃত্যুবরণ করলে এখানে তার মাজার গড়ে উঠে
এই মাজারটিকে ঘিরে প্রতিবছর উরস, দোয়া মাহফিল ও ঐতিহ্যবাহী মেলা
আয়োজন করা হয়। প্রায় সাড়ে তিনশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আয়োজিত
হয়ে আসা এই মেলার অবস্থান দেশের জাতীয় মেলা তালিকায় ২৯ তম।

বলু পীর চিরকুমার ছিলেন। সমগ্র জীবনভর চেয়েছেন নিভৃতে থাকতে।
বলু পীরের সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য জীবনী খুঁজে পাওয়া ভার। যশোর অঞ্চলের
মানুষের কাছে তিনি বেঁচে আছেন কিংবদন্তী হয়ে। তার অলৌকিকতার
নিদর্শন হিসাবে আজও ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন গল্প।

কঠিত আছে, বলুর বয়স যখন দশ কী বারো, তখন সে তার বাবা ছুটি
বিশ্বাসের কাছে আবদার করে বসলো তাকে গরু চড়াতে দিতে হবে। পাগল
ছেলেকে ছুটি বিশ্বাসের এই কাজ দিতে বাঁধে। কিন্তু বলু তার আবদারে
অনড়। একগুঁয়ে বলুর জেদের কাছে হার মানেন পিতা। মহানন্দে বলু গরু
চড়াতে গেল পাশের ব্যাদন বিলে। বিশাল খোলা প্রান্তরের পিঠ ঘেষে কলকল
শব্দে বয়ে গেছে নদী। অদূরে ফসলের ক্ষেত। প্রান্তরটি একধারে একটি
প্রকাণ্ড বটগাছ। মাঝেমধ্যে দুরন্ত গরুর পাল গিয়ে হানা দেয় ফসলের ক্ষেতে।
সবুজ কচি সদ্য জেগে ওঠা ধানের রোঁয়া তছনছ করে গরুর পাল। প্রতিদিন

দুপুর হলে রাখালেরা একজনের জিম্মায় গরু রেখে খেতে যায়। একদিন এই দায়িত্ব বর্তালো বলুর ওপর। দুপুর হলে রাখালেরা বলুকে রেখে খেতে গেলো গ্রামে। সেদিন গরুগুলো যেন অন্যান্য দিনের চেয়ে আরো দুরন্ত হয়ে উঠেছে। একের পর এক জমির ফসল নষ্ট করলো। রাখালের দল মাঠে ফিরে দেখতে পায় বিস্তৃত প্রান্তর জনশূন্য। তাজ্জব ব্যাপার, না গরুর দলের খোঁজ আছে, না বলুর! ধু ধু করছে গোটা মাঠ। রাখালেরা খুঁজতে খুঁজতে বটগাছের কাছে হাজির হয়। দেখে বলু পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, তার আশেপাশে প্রচুর সাদা বক যেন তার ঘুম ভাঙার অপেক্ষা করছে। রাখালেরা ওপরের দিকে তাকাতে বিস্ময়ে আঁতকে উঠলো। দেখল তিনটা বিশাল আকারের সাপ যেন বলুকে সূর্যের প্রখরতা থেকে রক্ষা করছে! ব্যস্ত সন্ত্রস্ত হয়ে বালকেরা বলুকে ডাকতে থাকে। একরাশ বিরক্তি নিয়ে বলু চোখ মেলে। রাখালেরা হড়বড়িয়ে গরুর কথা বলতেই দেখে বলুর ইশারায় বকগুলো নিচে নেমে গরু হয়ে ঘাস খাওয়ার কাজে লেগে গেছে।

ওদিকে চাষীরা বিচার দিয়েছে বলুর নামে, অন্যদিকে রাখালের এক ছুটে হাজির হয় ছুটি বিশ্বাসের কাছে। বলু বাড়ি ফিরলে ছুটি বিশ্বাস বলুকে লাগালো মার, প্রতিবেশীরা বলল, 'কবিরাজ দেখাও বাপু, দেখোগে জ্বীন ভূতের কাজ।' সবকিছু শুনে কবিরাজ বলল, 'ওরে গরুর গোশত খাওয়াও। তবে এর সমাধান মিলবে। বলুর মা রান্না করলেন গরুর গোশত কিন্তু বলুর খোঁজ তো আর মেলে না। তিনদিন ধরে লুকিয়ে রইলো কঞ্চির গাদার নীচে। আশ্চর্য, ক্ষুধাহীন পিপাসাহীন, অবাক করা ব্যাপার।

এত অশান্তি সহ্য হয় না বলুর। পরেরদিন ঘর ছাড়লো বলু, হাজির হলো মামার গাঁয়ে। নিঃসন্তান দম্পতি বলুকে মানুষ করতে লাগে পরম মমতায়। বলুর মামা কাজ করতো অন্যের ক্ষেতে। একদিন পাকা সরিষা ক্ষেতে বলুকে নিয়ে গেলেন তিনি। বলু সরিষা ক্ষেতে দিলো আগুন। সবাই হায় হায় করে উঠলো, কিন্তু বলু শুধু হাসে। বলু গম্ভীর গলায় ক্ষেতের মালিককে হুকুম দিলো, 'যা বস্তা লইয়া আয়।' আগুন নিভলে দেখা গেলো সরিষার গাছের চিহ্নও নাই ক্ষেত জুড়ে শুধু সরিষা ছড়িয়ে আছে। সেদিন থেকে গ্রামে সবাই বলুকে সমঝে চলতে লাগলো। বলু থাকে নিজের মতো করে, কখনো সখনো বনে চলে যায় নিজের মতো।

একদিন বলুর মামী চুলায় খেজুরের রস জাল দিচ্ছেন। গুড় বানানোর জন্য রসকে প্রচুর জ্বাল দেওয়ার প্রয়োজন হয়। একসময় লাকড়ি ফুরিয়ে যায়। এমতাবস্থায় বলুর মামী ছুটলেন জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যায় এমন শুকনো ডালপালা ও পাতা আনতে। ওদিকে বলু কিন্তু চুপচাপ বসে

নেই। নিজের দু'টি পা লাকড়ির মতো করে জ্বলন্ত চুলার ভেতর ঢুকিয়ে বসে আছে সে। মামী ফিরে আসার পর এই দৃশ্য দেখে তো জ্ঞান হারাবার উপক্রম। এক ছুটে চুলা থেকে বলুর পা দু'টি বের করে এনে আরো অবাক হয়ে যান। কী আশ্চর্য আগুনের লেলিহান শিখা বলুর একটি লোমকূপ পোড়াতে পারেনি! মামী তখনই প্রতিবেশী সবাইকে ডেকে অবাক করা এই ঘটনা দেখালো। সবাই এক বাক্যে মেনে নিলো বলু নিশ্চয় বড়োমাপের কোনো আউলিয়া। সেদিন থেকে বলু পীর হিসাবে মান্য হতে লাগলো।

বলুর মামার ছিল 'দিন আনি দিন খাই' অবস্থা। কখনো পরের ক্ষেতে কখনো বা মাটি কেটে তার সংসার চলে। একদিন মামা খুব অসুস্থ, কাজে যেতে পারেননি। ঘরে খাবার বলতে দু'মুঠো চাল। বলু বাড়ির আশেপাশে কয়েকটি বেগুনের চারা খুঁজে পেলো। তারপর কী মনেই হতেই সেগুলোকে তুলে পাশের ক্ষেতে লাগিয়ে দিলো। আশেপাশের মানুষ অবাক হয়ে বলুর কেরামতি দেখতে লাগলো। একটু পর দেখা গেল চারাগুলো বড়ো গাছে পরিণত হয়েছে। পরমুহূর্তে দেখা গেলো গাছগুলো থেকে তাজা বেগুন ঝুলছে। বলু এবার কয়েকটি বেগুন ছিড়ে নিয়ে মামীর হাতে দিলো রান্না করতে।

এই ঘটনার পর থেকে বলুর কেরামতির খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বহুদূর থেকে মানুষ আসতে লাগলো তার কাছে। লোকজনের অত্যাচারে বলু দ্বিতীয়বারের মতো ঘর ছাড়লো। এরপর তিনি সারাজীবন ভেসে বেড়িয়েছেন এখান থেকে ওখানে। আজও তার গ্রামের সেই বটবৃক্ষের তলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ষষ্ঠীপুজোর আয়োজন করে। তার মাজারে প্রতিবছর মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা আয়োজন করে উরস ও মেলার। বলু পীরের মাজারের এই ঐতিহাসিক মেলা গোটা যশোরে আর কোথাও হয় না।

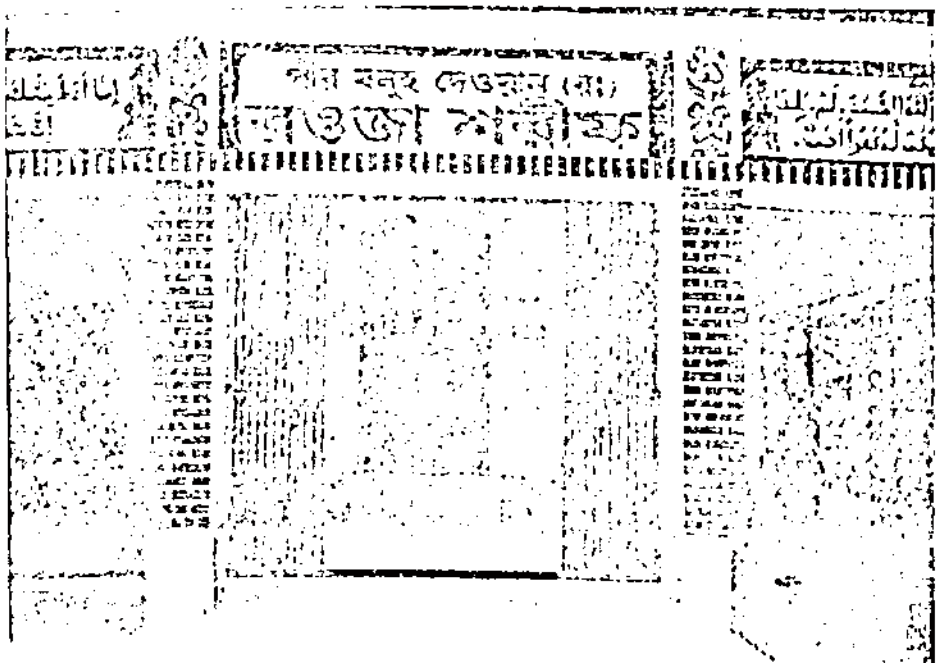

পিছইল্যা খালের বুড়ি পেত্নী

কথিত আছে, বকচরের পিছইল্যা খালে নাকি অনেকেই ধবধবে সাদা শাড়ি পরিহিত এক বুড়িকে দেখতে পেতো এককালে। জনশ্রুতি ছিল, ভরদুপুরে কিংবা সন্ধ্যা বেলায় কোনো পথিক একলা সেদিক দিয়ে যেতে গেলেই নাকি কোথা থেকে যেন এক বুড়ি এসে তার পথ আগলে দাঁড়ায় আর বলতে থাকে, আমাকে মারিস না। অনেকেই বিভিন্ন সময়ে দাবী করেছেন যে কখনো কখনো এই বুড়ির সাথে সাথে বেশ কয়েকজন সৈন্যকেও নাকি দেখতে পাওয়া যায়। পিছইল্যা খালের এই বুড়ির পেত্নী হয়ে ওঠাকে কেন্দ্র করে একটি কাহিনি শুনতে পাওয়া যায়।

দিল্লীর তখতে তখন মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর আসীন। মুর্শিদকুলি খাঁকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে দিল্লি থেকে প্রেরণ করা হয়েছে ঢাকায়। ঢাকা তখন এ অঞ্চলের রাজধানী। সুবাদার হয়ে বাংলায় আসার পর ঢাকা নাম বদলে তিনি সম্রাটের নামানুসারে জাহাঙ্গীরনগর রেখেছেন। কিংবদন্তীটি সেই সময়কার। হাড়গিলা নদীটি তখন বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর থানার বহরা গ্রামের উত্তরদিক দিয়ে প্রবাহিত হতো। আকারে খুব বেশি বড়ো না হলেও নদীটিতে ছিল প্রখর স্রোত।

একবার সম্রাটের সেনাপতিদের একজন বেশ কয়েকজন সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে জাহাঙ্গীরনগর থেকে মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করলেন। সেনাপতি সাহেবের বড়োসড়ো আকারের বজরাটি এগিয়ে চলেছে গন্তব্য মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে। এভাবে চলতে চলতে বজরাটি একদিন হাড়গিলা নদীতে প্রবেশ করলো। সারাদিন বজরা চললেও, বিকালবেলাতে সেটি ঘাটে ভিড়িয়ে রাখা হয়। বরাবরের মতো সেদিনও এর ব্যতিক্রম হলো না। বিকালবেলা বহরা গ্রামের ঘাটে বজরাটি ভিড়ল। সন্ধ্যার শুরুর দিকে, যখন আলো-আঁধারি খেলা করছে, সেনাপতি বজরার ছাদে আসন পেতে বসে হাওয়া খাচ্ছিলেন। ওই সময় কলসি কাঁখে একটি মেয়েকে নদীর ঘাটের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। মেয়েটি যখন নদী থেকে পানি সংগ্রহ করতে ঘাটে এসে পৌঁছল, তখন তার সৌন্দর্য সেনাপতির নজর কাড়লো। সেনাপতি দেখলো, আলো-আঁধারির লগ্নে পরমাসুন্দরী এক অষ্টাদশী কন্যা

নদী থেকে পানি সংগ্রহ করছে। মেয়েটির রূপে মুগ্ধ না হয়ে পারল না সেনাপতি। তার ওপর তার চরিত্রও খুব একটা সুবিধার ছিল না। আসার পথে কম কুকীর্তি সে করেনি। আর তার সব কুকীর্তিতে প্রধান সহযোগি হিসাবে সবসময় কাজ করেছে তারই রাঁধুনি খেপুর মা।

বৃদ্ধা হলেও খেপুর মায়ের মাথাভর্তি শয়তানি বুদ্ধি। বিকালে নদী ঘাটে বজরা ভিড়লে পাড়া বেড়াতে বের হয় খেপুর মা। কোনো মেয়েকে চোখে ধরলে সেনাপতিকে খুশি করতে মুখের মিষ্টি কথা ফুঁসলিয়ে নিয়ে আসে বজরায়। বজরার বাকিরাও কম যায় না। একমাত্র মাঝিটি ছিল ব্যতিক্রম। সেনাপতির এসব অপকর্ম একেবারেই পছন্দ করে না, কিন্তু কিছু বলতেও পারে না। কিছু বলার সামর্থ্য যে তার নেই। তারপরও কৌশলে একবার সে সেনাপতিকে বলল–হুজুর, নৌকা চালানো খুবই কঠিন কাজ। আপনি আমার কথা মানবেন কিনা সেটি আপনার ব্যাপার। আপনাকে আমি জোর করতে পারি না, কিন্তু কোনো কারণে নৌকা যদি অপবিত্র হয়ে যায় তাহলে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। একথা শুনে সেনাপতি খুব চটে গেলেন। তিনি মাঝিকে শাসালেন এবং নিজের কাজ করে যেতে বললেন। মাঝিও আর কথা বাড়ালো না।

এদিকে খেপুর মা যখন সন্ধ্যার একটু পর বজরায় ফিরে এলো, সেনাপতি তখন তাকে নদী ঘাটে দেখা পরমাসুন্দরী মেয়েটির কথা জানালো। খেপুর মায়ের জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল। সে খুব ভালো করেই জানে সেনাপতি কী চাইছে। পরদিন দিনের আলো ফুটলেও সেনাপতির নির্দেশে নৌকা ঘাটেই বাঁধা রইলো। সন্ধ্যার আগ দিয়ে খেপুর মা বুড়ি নদীর ঘাটে গিয়ে বসে রইলো। খানিকবাদেই আগের দিনের মতো মেয়েটি নদী থেকে পানি সংগ্রহ করার জন্য ঘাটে এলো। নদীর পাড়ে ভর সন্ধ্যায় এক অপরিচিত বৃদ্ধাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে মেয়েটি এগিয়ে গেল তার কাছে। দিদিমা বলে সম্বোধন করে ঘাটে একাকী বসে থাকার কারণ জানতে চাইলো। সেই সুযোগটাই কাজে লাগালো খেপুর মা। একথা সেকথা বলে ভাব জমাতে চেষ্টা করলো। মেয়েটি তখন কাঁখের কলসি পাশে নামিয়ে রেখে বৃদ্ধার পাশে বসলো। একথা সেকথা বলে যখন ইতোমধ্যে অনেকটা সময় পার হয়ে গেল তখন তাদের দুজনের মধ্যে একটা ভাব হয়ে গেছে। কথায় কথায় মেয়েটি জানালো–সে পাশের গ্রাম কুমারজগিতে থাকে। বাবা-মা কলেরায় আক্রান্ত হয়ে অনেক আগেই মারা গেছে। বড়ো হয়েছে দাদার কাছে। দাদার নাম এমারত খাঁ–একজন নামকরা লাঠিয়াল। একসময় বাড়ি ফিরে যেতে চাইলে বৃদ্ধা তাকে তাদের বজরা ঘুরে যেতে বলল। মেয়েটি তখন পরদিন এসে

বজরায় যাবে বলে কথা দিলো।

পরের দিনও বজরাটি ঘাটে বাঁধা রইলো। সন্ধ্যার আগ দিয়ে খেপুর মা নদীর ঘাটে বসে মেয়েটির জন্য অপেক্ষা করতে থাকলো। যথাসময়ে মেয়েটি পানি নিতে নদী ঘাটে এলে এবারে খেপুর মা তার কাছে এগিয়ে গিয়ে নিজ থেকেই কথা বলতে শুরু করে। ইনিয়ে বিনিয়ে একথা সেকথা বলে সময় ক্ষেপণ করলো। চারপাশে যখন অন্ধকার নেমে এলো, মেয়েটির বাড়ি যাওয়ার কথা বলে বিদায় চাইলে বুড়ি তখন বজরায় যাওয়ার কথা তুলে। বলে-তুমি কিন্তু বাপু গতদিন বলে ছিলে আজ আমাদের বজরায় যাবে। আজ কিন্তু যেতেই হবে এই দিদিমা'র সাথে। চিন্তা করো না, আমার বজরার পেয়াদারা তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবে।

মেয়েটি আর বারণ করলো না। ভাবলো, একটু সময় বজরায় যাওয়াই যায়। তারপর দিদিমা তো বললই, দেরি হলে পেয়াদারা এগিয়ে দিয়ে আসবে। সে তো আর জানতো না বজরার ভেতরে তার জন্য কী অপেক্ষা করছে। মেয়েটি যখন বজরার মধ্যে প্রবেশ করলো তখনই নিজের লালসা মেটাতে ভেতরে অপেক্ষায় থাকা সেনাপতিরূপী নরপিশাচটা ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর।

এদিকে মেয়েটির দাদা যখন দেখলো অনেক রাত হয়ে যাওয়ার পরও মেয়েটি এখনো বাড়ি ফিরছে না, তখন ভীষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গেল। বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর লাঠি হাতে এগিয়ে গেল নদীর ঘাটের দিকে। বলে রাখা ভালো নদীর ঘাটের কাছাকাছি কোনো বাড়িঘর ছিল না। প্রয়োজন ছাড়া এদিকে তেমন মানুষও খুব একটা আসে না বিকালের পর। যাই হোক, এমারত খাঁ ঘাটের কাছাকাছি পৌঁছাতেই দূরে আলো দেখতে পেলো। আলোটা যে বজরার তা বুঝতে বাকি রইলো না। আরেকটু এগিয়ে যেতেই একটা মেয়ের কান্নার আওয়াজ তার কানে এলো। কণ্ঠস্বরটা চিনতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না। হুঙ্কার করে উঠে আলোর দিকে ছুটে গেল। ততক্ষণে সেনাপতি আর তার চ্যালাচামুন্ডারাও সতর্ক হয়ে গেছে। বজরা থেকে চাবুক হাতে বেরিয়ে এলো সেনাপতি নিজেই। এমারত খাঁ তার নাগালের মধ্যে আসতেই ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এমারতের হাতে লাঠি আর সেনাপতির হাতে চাবুক। সেনাপতিটি এমারত খাঁ'র উদ্দেশ্যে সজোরে চাবুক চালালো। এমারতও বসে নেই। সেও হাতে থাকা লাঠিটি সেনাপতির মাথা বরাবর চালালো। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সেনাপতি। ততক্ষণে সেনাপতির সেপাইরা ঘিরে ফেলেছে এমারতকে। এমারত একা, তার ওপর বয়সও হয়েছে। একলা

একটা মানুষ এতজন জোয়ান মানুষের সাথে পেরে উঠবেই বা কী করে। তাই বলাই বাহুল্য, অল্পক্ষণের মধ্যে সেনাপতির লোকেদের হাতে ধরাশায়ী হয়ে পড়লো। এমারতের হাতপা বেঁধে বজরা ছইয়ের ওপর ফেলে রাখা হলো। আর তার নাতনীকে নদীর ঘাটে ফেলে রেখে সবাই গেল সেনাপতির শুশ্রূষা করতে। মাথায় বেশ আঘাত পেয়েছে। অবস্থা খুব একটা ভালো না। নৌকার সেপাইরা মিলে সিদ্ধান্ত নিলো বজরা সামনের চন্দ্রখোলা গ্রামের ঘাটে নিয়ে যাওয়া হবে। কারণ চন্দ্রখোলায় রয়েছে স্থানীয় বাজার। আর সেখানে হেকিম-বৈদ্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মাঝিকে নির্দেশ দেওয়া হলো বজরা ছাড়তে। নির্দেশ মতো মাঝি বজরা চালাতে চলে গেল। সময়মতো চন্দ্রখোলার ঘাটে নোঙর করলো বজরা। খুঁজে খুঁজে একজন বৈদ্যকেও পাওয়া গেল। সে যাত্রায় প্রাণ রক্ষা পেল সেনাপতির।

পরদিন সকালে সবাই যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, তখন একজন সেপাই খেয়াল করলো এমারত খাঁ বজরা ছইয়ের ওপরে নেই। সবাই ধরে নিলো রাতের বেলায় হয়তো ঘুমের ঘোরে বজরা থেকে নদীতে পড়ে গেছে। ব্যাপারটা নিয়ে কেউ আর তেমন মাথা ঘামালো না। কিন্তু আসল ঘটনা হলো সবাই যখন রাতে সেনাপতিকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তখন এক ফাঁকে নৌকার মাঝি এমারত খাঁ'র বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। ছাড়া পাওয়ার পর নদীর ঘাট থেকে নাতনীকে উদ্ধার করে বাড়িতে ফিরে আসে। নাতনী সুস্থ্য হলে তার মুখ থেকে সবটা শুনে সে। কীভাবে খেপুর মা বুড়ি তাকে ফুঁসলিয়ে বজরাতে নিয়ে গিয়েছিল সবটা খুলে বলে তার কাছে।

বজরা চন্দ্রখোলার ঘাটেই বাঁধা রইলো আরো কয়েকদিন। অপেক্ষা চলল সেনাপতির সুস্থ্য হওয়ার জন্য। কথায় আছে, কয়লা ধুলে ময়লা যায় না। খেপুর মায়েরও হয়েছে তাই। একটু অবসর মিলতেই চন্দ্রখোলা গ্রামে হাঁটতে বেরিয়ে পড়লো বিকালে। তার ওপর সেদিন ছিল হাটবার। কিন্তু সেদিন তার ভাগ্য মোটেও সহায় ছিল না। আচমকা কোথা থেকে যেন এমারত খাঁ এসে হাজির হলো। খেপুর মাকে চিনতে এমারতের খুব একটা কষ্ট হলো না। সেই রাতে বজরাতে অন্যদের সাথে তাকেও সে দেখেছিল। আর নাতনীর মুখ থেকে শোনা বৃদ্ধার বর্ণনার সাথে তার হুবহু মিল রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হত্যা করলো খেপুর মাকে। লাশটি পাশের পাটক্ষেতের মধ্যে ফেলে দিয়ে বাড়ি ফিরে যায় সে। সেই সময় ঐ পথ দিয়ে এক লোক হাট থেকে বাড়িতে ফিরছিল। আড়ালে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা সে দেখলো, কিন্তু প্রাণনাশের ভয়ে কোনো শব্দ করলো না।

অন্যদিকে খেপুর মায়ের ফেরার কোনো নাম নেই দেখে তাকে খুঁজতে সেপাইরা বেরিয়ে পড়লো। পথে যাকে সামনে পেল তাকেই জিজ্ঞাসা করলো। শেষমেশ সেই লোকটি দেখা পেলো যে কিনা আড়াল থেকে খেপুর মাকে খুন করতে দেখেছে। তার কথামতো পাটক্ষেতে গিয়ে খেপুর মায়ের লাশ পাওয়া গেল। কিন্তু কে খুন করেছে সেটা লোকটা বলতে পারলো না। কেবল বলল–মুখ ভর্তি পাকা দাড়ি ও মাথায় পাকা বাবরি চুলওয়ালা এক লোক তাকে মেরেছে। লোকটাকে বিদায় করে দিয়ে দাড়ি-বাবরি চুলওয়ালা লোক খুঁজতে বেরিয়ে পড়লো সেপাইরা। কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তারা দেখলো দাড়ি-বাবরি চুলওয়ালা একটা লোক এগিয়ে যাচ্ছে। তারা লোকটাকে বন্দী করে সেনাপতির কাছে নিয়ে যায়। সেপাইদের কাছে পুরো ঘটনা শুনে সেনাপতির মাথার ভেতর আগুন জ্বলে উঠলো। বন্দীর কোনো কথা শোনার অপেক্ষা করলো না, তেড়ে গেল লোকটা দিকে। তখন লোকটা সেনাপতিকে সাবধান করে দিলো। কিন্তু কে শুনে কার কথা। সেনাপতি গিয়ে লোকটার গালে কষে এক চড় বসালো। তখন লোকটা বলল–যা করলি ভালোই করলি। এজন্য তোকে খেসারত দিতে হবে।

কথাটা বলামাত্রই সবার সামনে লোকটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। কথিত আছে, যে বৃদ্ধকে খুনী ভেবে সেপাইরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সে ছিল ধানতারার একজন দরবেশ।

তখনই সেনাপতির শরীর কাঁপতে শুরু করলো ভীষণরকমের। তার লোকেরা ধরাধরি করে বজরা নিয়ে গেল। তাদের কাছে জায়গাটা নিরাপদ মনে হলো না। তারা বজরা ছাড়ার নির্দেশ দিলো মাঝিকে। নির্দেশ মতো মাঝি বজরা ছাড়ল। বজরাটি যখন কিনারা থেকে মাঝামাঝিতে গেল তখন অকস্মাৎ লোক-লশকরসহ নদীর জলের তলায় তলিয়ে গেল। কেবল মাঝিটিই বেঁচে গেল অলৌকিকভাবে।

কথিত আছে, নৌকাটা যেখানে ডুবে ছিল সেই জায়গাটায় নাকি একটা পাক তৈরি হয়েছিল, লোকে যাকে 'বাওয়ার মওলা' বলে সম্বোধন করে। ওই জায়গায় গিয়ে যে কত লোক যে ভয় পেয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। জনশ্রুতি শোনা যায়, একসময় ওখানে নাকি প্রায়শ উলঙ্গ অবস্থায় এক বুড়িকে গোসল করতে দেখা যেত। পাড় থেকে ঝাঁপ দিতো। কখনো কখনো দশ-বারো হাত শূন্যে উঠে গিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তো। পারতপক্ষে সবাই চেষ্টা করতো ঐ জায়গাটি এড়িয়ে যেতে।

শোনা যায়, কেউ যদি সন্ধ্যার পর ওখানে গোসল করতে যেত, দেখতো একটা বুড়ি এসে পেছন থেকে তার শরীর পরিষ্কার করে দিচ্ছে। যদি তাতে

কেউ বিরক্ত প্রকাশ করতো, তখন বুড়ি বলত–এমারত আমায় মেরেছে তাকে কি আমি ছেড়ে দেবো? একথা বলে নাকি নদীর জলে লোকটাকে চুবাত।

আরো কথিত আছে, একবার তিন যুবক বাহাদুরি দেখাতে রাতের বেলাতে ওদিকে নদীর ঐ পাড়ের দিকে যায়। তখন কোথা থেকে এক বুড়ি উদয় হয়ে তাদেরকে জড়িয়ে ধরে। তখন সবাই পানিতে পড়ে যায়। শুরু হয় ধস্তাধস্তি। কেউ কারোর চেয়ে কম যায় না। ধ্বস্তাধস্তির একপর্যায়ে বুড়ি যখন পেরে উঠছিল না তখন নাকি চেঁচিয়ে ওঠে–সেপাইরা কোথায়? তখন তারা দেখতে পায়, নদীর মাঝ বরাবর পানির নিচ থেকে একটা বজরা ভেসে উঠেছে। আর বজরার গলুইয়ের ওপর ঢাল-তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে একদল সেপাই। এই দৃশ্য দেখে ছেলেগুলো ভয় পেয়ে যায়। বুড়িকে ফেলে তারা যে যেভাবে পারে ওখান থেকে পালিয়ে আসে। বাড়ি ফেরার সবাই জ্বরে আক্রান্ত হয়। ডাক্তার, হেকিম, কবিরাজ, বৈদ্য কিছুতেই কিছু হয় না। শেষমেশ জুলু ফকির নামে বাবরিওয়ালা এক ব্যক্তি এসে সেই যাত্রা তাদেরকে রক্ষা করে।

তারা ফকিরকে অনুরোধ করে তিনি যেন পেত্নীকে মাওলা থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করেন। তাদের অনুরোধে ফকির মাওলায় গিয়ে আসন পেতে বসে। তাকে দেখে তেড়ে আসে বুড়ি পেত্নী। তখন ফকির জিব গাছের ডাল দিয়ে বেদম পেটাতে আরম্ভ করে। ফকিরের হাত মার খেয়ে পেত্নী মাওলা ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

এরথেকে বুড়ি পেত্নী আশ্রয় নেয় বকচরের পিছইল্যা খালে। কখনো কখনো মানুষের সামনে পড়লে বলে–আমাকে মারিস না, আমাকে মারি না।

ঢোলসমুদ্র দিঘি : দুই দিঘি, দুই গল্প

ঢাক বাজে টাগডুম টাগডুম
ঢোলসমুদ্রের তলে;
কিংবদন্তী লুকিয়ে আছে
সবাই তো তা বলে।

বাংলা কিংবদন্তী বইয়ের প্রথম কিস্তিতে শুনিয়েছিলাম বাংলাদেশের দুটি বিখ্যাত খননকৃত দিঘির গল্প–রামসাগর ও কমলারানির দিঘি। চারটি একই নামের দিঘির খোঁজ পেয়েছিলাম তখন। ঘটনা মোটামুটি এক পার্থক্য বলতে সময়কালের হেরফের। এটা ঘটা কিংবদন্তীর গল্পগুলোর ব্যাপারে খুবই স্বাভাবিক। মজার ব্যাপার হলো পূর্বে ছোটোখাটো রাজা কিংবা জমিদারবাবুরা বড়োসড়ো কোনো দিঘি খনন করিয়ে নাম বসিয়ে দিতো "সাগর/সমুদ্র"। তারপর রাজা কিংবা জমিদারবাবুটির মহিমা প্রচারের স্বার্থে চাটুকারেরা এর সাথে জুড়ে দিতো অদ্ভুত গল্পগাথা। সেইসব গল্পগাথার অনেকগুলোই আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। শত বছর ধরে মানুষের জবানেই তো বেঁচে থাকে কিংবদন্তী।

বাংলা কিংবদন্তী দ্বিতীয় কিস্তিতে শোনাতে চাই একই নামের আরো দুটি দিঘির গল্প। দিঘি দুটির নামও বড়োই অদ্ভুত : ঢোলসমুদ্র। ঢোল হচ্ছে চামড়া দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্র, বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের আসরে ঢোল একটি প্রধান বাদ্যযন্ত্র। আর সমুদ্রের অর্থ তো আমরা সকলেই জানি। দিঘির এমন নামকরণের পেছনে রয়েছে মর্মান্তিক এক দুঃখগাথা।

।। এক ।।

প্রথম যে দিঘিটি সম্পর্কে বলবো, সেটি গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার বোয়ালি থানায় অবস্থিত। সপ্তম শতাব্দিতে ভাওয়াল পরগনার ডাকুরাইল মৌজার রাজা ছিলেন পালবংশের যশোপাল। তার রাজবাড়ির পাশেই ছিল ঢোলসমুদ্র দিঘিটি। হয়তো তিনিই এই দিঘিটি খনন

করিয়েছিলেন প্রজাদের কষ্ট লাঘবের জন্য। তবে ঢোলসমুদ্র দিঘি কোন রাজা খনন করিয়েছিলেন সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো তথ্যই আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষের মুখে আজ শুধু একে নিয়ে একটি কাহিনি ঘুরে ফেরে।

ভাওয়ালের বিস্তৃত অঞ্চল একবার প্রচণ্ড খরায় ধুঁকছে। পুকুর, কুয়ো, নদী, বিল কোথাও একফোঁটা পানি নেই। প্রজাবৎসল রাজা হুকুম দিলেন গভীর এক দিঘি খনন করার। রাজার আদেশের প্রেক্ষিতে প্রজারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলো। শুরু হলো দিঘি খনন। অনেক গভীর পর্যন্ত খনন করা হলো। কিন্তু এরপরেও পানির দেখা মিলল না। রাজার চোখে ঘুম নেই; মনে শান্তি নেই। দিঘিটি এতটাই গভীর করে খোঁড়া হয়েছে যে সেটির পাড়ে দাঁড়িয়ে তলদেশ দেখা যায় না, তা সত্ত্বেও কেন যেন পানির দেখা নেই! প্রজারা দিনরাত রাজবাড়ির সামনে হাপিত্যেশ করতে থাকে। এতে রাজার খুব কষ্ট হয়।

একদিন গভীর রাতে রাজার চোখ দুটো একটু লেগেছে অমনি রাজার কানে দৈববাণী ভেসে আসে, 'তোর নাবালক শিশু সন্তানটিকে পবিত্র জলে স্নান করিয়ে, পাটবস্ত্র পরিধান করিয়ে দিঘিতে পুজো দিস।' রাজার কাঁচা ঘুম কেটে যায় শীঘ্রই। জোরে হাঁক ছাড়তেই উপস্থিত হয় পেয়াদা। আদেশ করেন নিজের আমর্ত্যদের হাজির হতে। সেই আদেশ উপেক্ষা করে এমন সাধ্য কার। আমর্ত্যরা হাজির হলে স্বপ্নের কথা তাদেরকে খুলে বললেন রাজা। এ আর এমন কী ব্যাপার! ঠিক হয় পরের দিন সকালে পুজো দেওয়া হবে দিঘিতে।

সাজ সাজ রব পড়ে গেল দিঘিরপাড়ে। স্বপ্নে পাওয়া দৈবী আদেশ অনুযায়ী পরের দিন রাজা নিজের শিশুপুত্রকে স্নান করিয়ে নতুন পাটবস্ত্র পরিয়ে এগিয়ে চললেন দিঘিপানে। রাজা, রাজপুত্র আর আমর্ত্যগণ এগিয়ে চলে, আর তাদেরকে পেছন থেকে অনুসরণ করে ঢোল বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলে ঢুলির দল। দিঘির চারপাশে মানুষ আর মানুষ। আমর্ত্য পরিমণ্ডিত হয়ে দলটি দিঘির মাঝ বরাবর উপস্থিত হয়। শিশু রাজকুমার পিতার শেখানো মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে পরম নিষ্ঠার সাথে। চোখ নির্মলিত। সহসা তার মন্ত্র উচ্চারণের শব্দ যেন মিশে যেতে ঢাকের টাগডুম টাগডুম শব্দে। ভেজা মাটির ঘ্রাণ নাকে স্বস্তি দিতে থাকে রাজার।

দেবী শুনেছে! ঐ তো জলের কলকল ধ্বনি শোনা যায়!

আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচতে নাচতে দিঘির ওপরে উঠে আসে রাজা ও তার আমর্ত্যের দল। ততক্ষণে প্রবল বেগে জলের ঘূর্ণি প্লাবিত হয় দিঘি ঘিরে। পেছনে পড়ে রয় শিশু রাজকুমার। তার কথা যখন স্মরণে আসে

ততক্ষণে দিঘিটি কানায় কানায় জলে পরিপূর্ণ। চারদিকে রাজার নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকে প্রজারা। রাজকুমারের আত্মাহুতিতে যদি প্রজাদের মুখে হাসি ফোটে তবে তাই হোক। রাজা দিঘির নাম দিলেন "ঢোলসমুদ্র", কারণ দিঘির পাড়ে যখন ঢুলিরা ঢোল বাজাচ্ছিল, তার প্রতিধ্বনিতে দিঘির জলে অতি চমৎকার সুর ভেসে আসছিল।

কালিয়াকৈরের এই দিঘিটি নিয়ে যদিও আরেকটি কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে। খরায় প্রজাদের কষ্ট লাঘব করতে দিঘি খনন করানোর পরেও যখন পানির দেখা মিলল না, কথিত আছে রাজা তখন হুকুম দিলেন আরো গভীর করে খনন করতে। একসময় দিঘির তল মানুষের দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেল। তবুও যখন পানির দেখা মিলল না, রাজা তখন দিঘির গভীরতা পরিমাপের সিদ্ধান্ত নিলেন। এজন্য একদল ঢুলিকে নিচে নামানো হলো। তারা জোরে জোরে ঢোল বাজালে রাজপণ্ডিত দিঘিটির গভীরতা পরিমাপ করবেন।

ঢুলিরা দিঘির তলদেশে দাঁড়িয়ে ঢোল বাজাতে লাগলো ঠিকই, কিন্তু সেই আওয়াজ ওপর থেকে শোনা গেল না। তবে ঢোল বাজানোর সাথে সাথে জল উঠতে শুরু করলো দিঘিতে। আর সেই জলেই সলিলসমাধি হলো ঢুলিদের দলটির। আর এভাবেই দিঘিটির নাম ঢোলসমুদ্র হলো বলেও জনশ্রুতি রয়েছে।

দিঘির পাড় জুড়ে দেখা যায় বিস্তৃত উঁচু সমতল ভূমি। মাঝেমধ্যে চোখে পড়ে স্তূপকৃত ইটের কংকাল। এটিকে বৌদ্ধ চৈত্যে একটি স্মারক বলে কেউ কেউ ধারণা করেন। হয়তো বা এর পাড় খনন করলে বেরিয়ে আসতে পারে কালের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া কোনো বৌদ্ধ বিহার। এটি যে একেবারেই অসম্ভব তা নয় কারণ পালরাজারা যে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তা আমাদের সকলেরই জানা। আনুমানিক ৬০০×৩০০ বর্গহাতের দিঘিটির অস্তিত্ব আজ বিলীন হওয়ার পথে।

।। দুই ।।

'ঢোলসমুদ্র দিঘি' নামে আরেকটি দিঘি রয়েছে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা ঝিনাইদহে। দিঘিটির অবস্থান ঝিনাইদহ জেলাশহর থেকে চার কিলোমিটার দূরে, পাগলাকানাই ইউনিয়নের বাড়ি বাথান গ্রামে। ৫২ বিঘা জমির ওপর খননকৃত এই দিঘিটির কীর্তি গড়েন রাজা মুকুট রায়। সেই সময়

যশোর অঞ্চলে তিনজন মুকুট রায় রাজত্ব করতেন। আর এই তিনজনই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। সেই তিনজনের একজন হলেন ঝিনাইদহ অঞ্চলের প্রভাবশালী জমিদার রাজা মুকুট রায়। এই ঢোল সমুদ্রকে কেন্দ্র করে আজও একটি রোমাঞ্চকর উপাখ্যান ঝিনাইদহ অঞ্চলের মানুষের মুখে শোনা যায়।

রাজা মুকুট রায়ের আমলে একবার ভীষণ জলকষ্ট দেখা দিলো। প্রজামহলে জলাভাবের দরুণ পড়ে যায় হাহাকার। গ্রামে গ্রামে প্রতিদিন মানুষের নিদারুণ কান্নার স্বরে বাতাস ভারি হয়ে উঠে নিয়মিত। প্রজারা মৃত্যুবরণ করতে লাগলো পানির অভাবে। চারিদিকে আর্ত মানুষের 'পানি পানি' রব শোনা যায় শুধু। কোথাও একফোঁটা পানির চিহ্ন নেই। বিল, বাওড়, নদীনালা, পুকুর সবই পানি শূন্য হয়ে গেছে। সব যেন বাষ্প হয়ে ডানা মেলেছে আকাশে। চৈত্রের কাঠ ফাটা রোদে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

রাজা মুকুট রায় প্রজাদের এই নিদারুণ দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারলেন না। মনস্থির করলেন, প্রজাদের কল্যাণে বিরাট একটি জলাশয় খনন করবেন। সেই জলাশয়ের শীতল মধুর জলে তৃষ্ণা নিবারণ করবে রাজার অগণিত প্রজারা। প্রজার মুখের হাসিতে সুখী হবেন রাজা। রাজ্যে ফিরে আসবে শান্তি। তার রাজ্যে হাসিখুশি গমগম করবে। প্রতি বছরের খরা থেকে রক্ষা পাবে তার রাজ্য।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। দেখতে দেখতে জলাশয় খননের কাজও শুরু হয়ে গেল একটা সময়। অসংখ্য লোক নিয়োগ করা হলো জলাশয় খনন করার এই কাজে। কোদালের আঘাতে তাল তাল মাটি উঠে আসতে লাগলো। ধীরে ধীরে জলাশয় গভীর থেকে গভীরতর হলো। তবুও পানির নিশানা পাওয়া গেল না। দিনের পর দিন চলতে লাগলো মাটি কাটার কাজ।

রাজা পানি না দেখে দুশ্চিন্তায় পড়লেন। পানির জন্যে পূজা দিলেন। অনেক অনুষ্ঠানাদি পালন করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। রাতে ঘুমুতে পারেন না রাজা। একদিকে প্রজামহলে হাহাকার, অন্যদিকে জলাশয়ের পানির জন্যে দুশ্চিন্তা। আস্তে আস্তে হতাশায় ভেঙ্গে পড়তে লাগলেন।

অবশেষে রাজা একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন, যদি রানি জলাশয়ে নেমে পূজা দেন, তবেই নব্য খননকৃত জলাশয়ে পানি উঠবে।

রাজা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে রানিকে স্বপ্নের কথা বলতে বাধ্য হলেন। রানি নিজেও ছিলেন প্রজাহিতৈষী। রানি প্রজাদের হিতার্থে বললেন, "আমি প্রস্তুত, প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হোক।"

রাজগুরু একদিন শুভদিন দেখে রানিকে পুজোর আয়োজন করতে বললেন। সকল প্রজারা বুক ভরা আশা নিয়ে উপস্থির হলো পূজা দেখতে। জলাশয়ের পাড়ে বাজতে লাগলো সানাই নহবত ও ঢোল সহরত। সানাইয়ের সুর আর ঢোলের মিঠা বোল ছড়িয়ে পড়তে লাগলো বাতাসে। রানি পূজার থালা নৈবেদ্য সহকারে শুষ্ক জলাশয়ের দিকে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে লাগলেন। একসময় উপস্থিত হলেন গহীন তলদেশে। অবশেষে জলাশয়ের শেষ স্তরে এসে যখন তিনি পা রাখলেন, তখন দেখা গেল জলাশয়ের একদিক মাটি ফেটে প্রচণ্ড আলোড়নে হু হু করে তীব্রবেগে ছুটে আসছে অজস্র জলের ধারা। রানি পূজার নৈবেদ্য দিয়ে ওপরে উঠে আসতে লাগলেন। দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ঢোলের শব্দ। ঢোল যত জোরে বাজতে লাগলো, পানিও উঠে আসতে লাগলো তত বেগে। প্রজারা উল্লাসে মেতে উঠলো। অবশেষে পানির দেখা মিলেছে, এবার সবার তৃষ্ণা নিবারণ হবে। আনন্দ কলরোলের মধ্যে প্রজারা শুভাশীষ বর্ষণ করতে লাগলো রাজা-রানির প্রতি।

রানি ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসছেন। পানিও কল কল নাদে পাক খেয়ে খেয়ে রানির পায়ের ওপরে এসে আছড়ে পড়তে লাগলো। দেখতে দেখতে হাঁটু পর্যন্ত উঠে এলো পানি। তারপর কোমল পর্যন্ত। তারপর বুক পর্যন্ত। ঢোলের বাদ্য তখনো দ্রুত তালে বেজে চলেছে। একসময় রানির মাথা ডুবে গেল। শুধু ভাসতে লাগলো কালো চুলের রাশি। একসময় তাও দেখা গেল না। রাজা আর্তস্বরে কেঁদে উঠলেন। সেই সঙ্গে প্রজারাও। একটু আগে যেখানে আনন্দ উল্লাস ধ্বনি ভেসে বেড়াচ্ছিল, সেখানে নেমে এলো কালো বিষাদের ছায়া। রানি আর কখনো উঠে এলেন না চরাচরে। রানির সলিলসমাধিতে পূর্ণতা পেলো ঢোলসমুদ্র দিঘি। এরপরও মুকুট রায়ের রাজত্ব চলেছে বহুদিন। সৃষ্টি করেছেন বহু গৌরবগাথা।

কিন্তু এই বিয়োগান্তক কাহিনি আজও শোনা যায় এ অঞ্চলে। লোকে দিঘির পাড়ে বসে অবলোকন করে এর সৌন্দর্য।

কিশোরগঞ্জের ছয়টি কিংবদন্তী

বাংলাদেশের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হাজারো কিংবদন্তী। সেসব কিংবদন্তীর সবটা আমাদের সবার জানা নেই। এরমধ্যে কিছু কিংবদন্তী রয়েছে যা একেবারেই অঞ্চলভিত্তিক হওয়ায় খুব বেশি প্রচারণা পায় না। এতে করে সেসব কিংবদন্তী কাহিনিগুলো আড়ালেই থেকে যায়। এমনি কিছু অঞ্চলভিত্তিক কিংবদন্তী থাকছে এই কিস্তিতে। আর এজন্য বেছে নেওয়া হয়েছে কিশোরগঞ্জ জেলাকে।

কিশোরগঞ্জ বাংলাদেশের ছোট্ট একটি জেলা। হাওড় ও সমতলভূমির সমন্বয়ে গঠিত বৈচিত্র্যময় ভূপ্রকৃতির সমন্বয়ে গঠিত বিস্তীর্ণ জনপদ আমাদের এই কিশোরগঞ্জ জেলা। এই জেলার নামকরণের সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। তবে এরূপ নামকরণ নিয়ে একটি জনশ্রুতি সবথেকে জনপ্রিয়। কথিত আছে, বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত বত্রিশ পরামানিক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণদাস পরামানিকের ষষ্ঠ ছেলে নন্দকিশোর পরামানিকের নাম থেকে এ জেলার নামকরণ করা হয়েছে কিশোরগঞ্জ। এই নন্দকিশোর ছিলেন একুশ রত্নের স্রষ্টা। ধারণা করা হয়, নন্দকিশোরের নামের 'কিশোর' এবং এর তারই প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় হাট বা গঞ্জের 'গঞ্জ' যুক্ত হয়ে কিশোরগঞ্জ নামের উৎপত্তি। যদিও এ নিয়ে অনেক মতবিরোধ রয়েছে।

এ জেলায় রয়েছে নানারকম লোকজপ্রথা। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে বিভিন্ন বিশ্বাস। যেমন–বাঁশের নেইল দিয়ে সদ্যজাত নবজাতকের নাড় কাটা এখানকার লোকজ প্রথাগুলোর একটি। নেইল হলো কাঁচা বাঁশের গা থেকে পাতলা ছাড়িয়ে নেওয়া বাঁকল, যা কিছুটা ধারাল থাকে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন আপদবিপদ থেকে আঁতুড়ঘরটিকে মুক্ত রাখতে সরিষা ও ধূপ দিয়ে চোঁহল জ্বালিয়ে রাখা হয়। নবজাতককে জ্বীন-ভূত আছড়ের হাত থেকে রক্ষা করতে ঘরের চৌকাঠে চামড়ার ছেঁড়া জুতো, গরুর হাড়, ছেড়া জাল বা জালের কাঠি ঝুলিয়ে রাখা হয়।

এ অঞ্চলের মানুষ এও বিশ্বাস করতো যে–বড়ো বড়ো গাবগাছ, শিমুলগাছ, শ্যাওড়া গাছ ও বটগাছে নাকি জ্বীনভূতেদের আখড়া। জেনেশুনে কিংবা অজান্তে কোনোপ্রকার অমর্যাদা হলে অপরাধীকে তারা ভয়ঙ্কর শাস্তি

প্রদান করে। অনেকের পিঠে নাকি আবার সেই খবিস জ্বীনের বড়ো আকারের পাঁচ আঙ্গুলের স্পষ্ট ছাপ প্রায়ই দেখা যায় বলে প্রচুর জনশ্রুতি শোনা যেত একসময়। এখনো অবশ্য অনেকে এসব বিশ্বাস করে থাকে।

এসব জ্বীন-ভূতের হাত থেকে বাঁচতে ঠিক দুপুরবেলা, কিংবা অন্ধকার রাতে বা অমাবস্যার রাতে তাদের আস্তানার নিচ দিয়ে পারতপক্ষে কেউ পা মাড়ায় না। বিশেষত মাছ বা শুঁটকির তরকারী দিয়ে ভাত খাওয়ার পর দাদী, নানী, চাচী, জেঠীরা বামহাত দিয়ে মুখ মুছে বাইরে বের হওয়ার উপদেশ দিতেন। এখনো এসব উপদেশের প্রচলন রয়েছে। রাতের বেলা হাতে মোটা নলের ভম্বল নিয়ে বাইরে বের হতে বা বাজারে যেতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। উল্লেখ্য ভম্বল হলো কেরোসিন তেল দিয়ে জ্বালানো হয় এমন লণ্ঠন বিশেষ। গিট্টুবাজ জ্বীন কেবল যে বহির্গামী পুরুষদেরই ধরে তাই নয়, নারীদের ওপরও নাকি আছর করে, বিশেষত সুন্দরী নারী, কুমারী মেয়েদের। কুশ্রী নারীদের প্রতিও যে একেবারে আসক্ত হয় না এমনটা নয়। কত রুচির জ্বীনের গল্প ছড়িয়ে আছে পল্লীসমাজে তা আর কতটাই বা আমাদের জানা আছে! ঠিক মানুষের পছন্দঅপছন্দের মতো। ভালো জ্বীনেরা নাকি টাটকা মিষ্টি এনে খাওয়ায়, হিমালয় পর্বত বা অন্যদেশ থেকে কাঁচা এলাচ এনে দেয় বলেও জনশ্রুতি রয়েছে।

এসব জিন-ভূত তাড়ানোর কৌশলগুলোও অদ্ভুত। মোল্লা, ফকির, মৌলভী বা ওঝারা আসেন। ঝাড়ফুঁক করেন। জিন বা ভূতের সাথে বাকবিতণ্ডা হয়। বিভিন্ন আপোস রফা হয়। পানি পড়া ছিটিয়ে দেওয়া, ঝাড়ু পেটা করা সহ আরো অনেক কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় কী করলে বা পেলে তারা চলে যাবে। কখনো সোয়া পাঁচ সের চাউল, সোয়া পাঁচ আনা পয়সা বা একটা কালো রঙা মুরগি অমুক দিন দুপুরবেলা বা দুপুর রাতে অমুক বটগাছের তলায় রেখে আসতে হবে। কেউ পেছন দিক দিয়ে ডাকলে কোনোক্রমে ফিরে তাকানো যাবে না। তাকালেই ঠিক মারা পড়বে। হাওড় অঞ্চল হওয়ায় এখানে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। আর এ কারণেই জ্বীনভূতে বিশ্বাসটাও এখানকার মানুষের মধ্যে একটু বেশি।

কিশোরগঞ্জ জেলাতে রয়েছে ঈশা খাঁ'র জঙ্গলবাড়ি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর বাড়িও এই জেলাতে। উল্লেখ্য চন্দ্রাবতী ময়মনসিংহ গীতিকার *দস্যু কেনারাম* ও *মলুয়া* পালার রচয়িত। শুধু তাই নয়, বাংলা রামায়ণের রচয়িতাও ছিলেন এই চন্দ্রাবতী। তার পিতা দ্বিজবংসী দাস ছিলেন *মনসামঙ্গল* কাব্যের রচয়িতা। এই জেলাতে রয়েছে উপমহাদেশের সবচেয়ে বড়ো ইদগাহ ময়দান–যেটি শোলাকিয়া ইদগাহ নামে পরিচিত। এই

ইদগাহটির নামকরণ নিয়েও রয়েছে জনশ্রুতি। কথিত আছে, ইদগাহটিতে প্রথমবার এক লক্ষ পঁচিশ হাজার অর্থাৎ সোয়া লাখ মানুষ সমবেত হয়ে একসাথে ইদের নামাজ আদায় করেছিল। সেই থেকে এর নাম হয় সোয়া লাখিয়া, যা পরবর্তীকালে শোলাকিয়া হয়েছে। যদিও অন্য একটি জনশ্রুতি বলছে, মুঘল আমলে এই পরগনার রাজস্বের পরিমাণ ছিল তৎকালীন সময়ের সোয়া লাখ টাকা। এ থেকেও এরূপ নামকরণের সৃষ্টি হতে পারে বলেও কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করে থাকেন।

সারা কিশোরগঞ্জ জেলাজুড়ে রয়েছে এ ধরনের বিভিন্ন বিশ্বাস, লোকজপ্রথা, জনশ্রুতি, ঐতিহ্য। আজকের দিনে এসেও এখানকার মানুষেরা এসবে বিশ্বাস করে। আর যারা এসব বিশ্বাস করে তারা যে কেবল অশিক্ষিত এমনতা ভাবা ভুল। বরং শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে বিভিন্ন মানুষ এসব জনশ্রুতিকে সত্য বলে এখনো বিশ্বাস করে থাকে। এ জেলায় রয়েছে বেশকিছু কিংবদন্তীর প্রচলন। আগের কিস্তিতে কিশোরগঞ্জজেলার একটি কিংবদন্তী ঠাঁই পেয়েছিল। দ্বিতীয় কিস্তির এই অংশে কিশোরগঞ্জ জেলা নিয়ে থাকছে প্রচলিত ছয়টি কিংবদন্তী।

।। ১. গোপাল সিংহের কুঁড়ে।।

অনেককাল আগের কথা। সেকালে বৌলাই ইউনিয়নের পূর্বাংশে ছিল একটি কুঁড়েঘর। লোকে সেই কুঁড়ের নাম দিয়েছিল গোপাল সিংহের কুঁড়ে। কুঁড়েটির এ ধরনের নামকরণের পেছনে স্থানীয়দের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে একটি কিংবদন্তী।

কথিত আছে অনেককাল আগে ধেনু থেকে এখানে একটা নদী উৎপন্ন হয়েছিল। নদীটি কুঁড়েটির পাশ দিয়ে গিয়ে মিলিত হয়েছিল নরসুন্দার সাথে। সেই নদীটির তীরেই ছিল গোপাল সিংহ দেওয়ানের কোঠাবাড়ি। দেওয়ানের ছিল সাত পুত্র। তিনি তার জেষ্ঠ্য ছয়পুত্রের বিয়ে দিয়েছিলেন তারই মতো বনেদী পরিবারের কন্যাদের সাথে। কিন্তু কী এক অদ্ভুত কারণে তিনি তার সপ্তম তথা সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের বিয়ে দিয়েছিলেন ঐ গ্রামেরই এক দরিদ্র পরিবারের মেয়ের সাথে। কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্রের বউ হয়ে যে মেয়েটি দেওয়ান বাড়ি এসেছিল, সে ছি দেববংশীয়া। কিন্তু সেই কথা সবার অজানাই ছিল।

যা হোক, গোপাল সিংহ দেওয়ানের বাড়ির রান্নার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তার সাত পুত্রবধূর ওপর। তারা পালাক্রমে এক একদিন একজন রান্নার কাজ

করতো। তখনই এক অদ্ভুত ব্যাপার সবার নজরে এলো। বাড়ি বড়ো ছয় পুত্রবধূদের রান্নার দিন বাজার থেকে রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের যোগান দিতে হতো, কিন্তু কী এক অদ্ভুত কারণে যেন যেদিন ছোটো বউয়ের রান্না থাকতো সেদিন তাকে কোনোকিছুর যোগান দিতে হতো না। তাই বলে সেদিন যে বাড়ির লোকেদের অন্ন সংস্থান বন্ধ হয়ে যেত, কিংবা তারা যে ভালোমন্দ খেতে পারতো না এমনটা নয়। বরং বরাবরের মতো হরেক রকমের মাছে পরিপূর্ণ থাকতো। পরিবারের সদস্যরা এতে ভীষণ অবাক হতো। তারা সবসময়ই ভাবতো তাদের বাড়ির ছোটো পুত্রবধূটি এত মাছ কোথা থেকে পায়! কিন্তু কেউই এই রহস্যের তল উদঘাটন করতে সক্ষম হয় না। এক গোপাল সিংহের স্ত্রী কনিষ্ঠ পুত্রবধূটির কাছে জানতে চাইলো এসব মাছের উৎস কী। জবাবে সে তার শাশুড়িকে জানালো–এসব জানানো যাবে না, জানলে সংসারে ঘোর অমঙ্গল নেমে আসবে। কিন্তু পরিমাণ হলো উল্টো। শাশুড়ি ও পরিবারের অন্যান্যরা মেয়েটিকে অসতী ভেবে বসলো। তারা ধারণা করলো, তার হয়তো অন্য কোনো পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে যে তাকে ভালোবেসে মাছগুলো এনে দেয়। কথাগুলো কেবল পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না। একটা সময় পরিবারের সীমানা পেড়িয়ে ছড়িয়ে পড়লো পাড়াময়। বিষয়টা মেয়েটির শ্বশুরের কানেও পৌছল। এতে করে ভীষণ ক্রোধান্বিত হলো গোপাল সিংহ। না হয়েই বা কী উপায়। ঘরের বউ তার পরিবারের সম্মানের হিস্যা। তাকে নিয়ে যদি বাজে কথা ছড়াতে থাকে তাহলে পরিবারের সম্মানহানি হয়।

গোপাল সিংহ তৎক্ষণাৎ কনিষ্ঠ পুত্রের স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। শ্বশুরের আদেশ পাওয়া মাত্রই হাজির হলো মেয়েটি। গোপাল সিংহ তাকে মাছের পেছনে থাকা রহস্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। কিন্তু মেয়েটি কোনো সদুত্তর দিলো না। উল্টো শ্বশুরকে সে বলল, মাছ কোথা থেকে পাই আমি যদি তা বলে দেই তাহলে আপনার এই বাড়ি পাতালে ডুবে যাবে।

পুত্রবধূর কথায় গা করলেন না গোপাল সিংহ। নাছোড়বান্দা সে। একটা বিহিত আজ সে করেই ছাড়বে। এসব আজগুবি কথায় তার মন শান্ত হয় না। মাছের রহস্য জানতে অনেকটা চেপে ধরেন তিনি। কিন্তু মেয়েটি কোনোক্রমেই মুখ খুলে না। এদিকে মুখ না খুলেও থাকা সম্ভব নয়। কেউ তার কথা শোনবার নয়। শেষমেশ বাধ্য হয়ে মেয়েটি বাড়ির সবাইকে নিয়ে যায় রসুইঘরে। ঘরের চৌকোর কাছে আবদ্ধ জায়গা। সেটির ঢাকনা খুলতেই সবার চোখ চড়কগাছ। সেখানে একটা সুড়ঙ্গ রয়েছে। আর সুড়ঙ্গটির মধ্যে যেন সমগ্র পৃথিবীর মাছ এসে জড়ো হয়েছে।

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। মেয়েটি অনেকবার সতর্ক করা সত্ত্বেও সবাই তার সাবধান বাণী কানে তুলেনি। কিন্তু তাই বলে কি কর্মের ফল ভোগ থেকে বিরত থাকে? আচমকা বাড়িটি কাঁপতে শুরু করলো। খানিকবাদে সবকিছু বদলে গেল। এবার কম্পনের বদলে বাড়িঘর, দালানকোঠা সব ঘুরপাক খেতে শুরু করলো। অল্পক্ষণের মধ্যে শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড়। দেখতে দেখতে সেই ঝড়ে গোটা বাড়িটা ভূগর্ভের নিচে তলিয়ে গেল। ঘটনার পরের দিন গ্রামের লোকেরা দেখলো, গোপাল সিংহের বাড়ির জায়গায় একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর দেখা গেল। ঘরটা কে বানালো সে সম্পর্কে কারোরই কোনো ধারণা নেই। আর পাকা দালানটাই বা কোথায় হারিয়ে গেল তাও কেউ বলতে পারে না।

পরবর্তীকালে গ্রামের লোকেদের কাছে কুঁড়েঘরটি গোপাল সিংহের কুঁড়ে নামে পরিচিতি পেয়েছিল।

।। ২. নরসুন্দা নদীর কিংবদন্তী ।।

কিশোরগঞ্জের পূর্বাঞ্চলে, চৌগঙ্গা থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিমদিকে অবস্থিত হোসেনপুরে ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে নরসুন্দা নদী। এই নদীটির উৎপত্তি নিয়ে প্রচলিত রয়েছে একটি কিংবদন্তী।

শোনা যায়, বহুকাল পূর্বে চৌগঙ্গা এলাকায় বসবাস ছিল এক ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী দম্পতির। দম্পতিটি ছিল নিঃসন্তান। সহসা একদিন তারা একটি কিশোরী মেয়ের দেখা পায়। মেয়েটি ব্রাহ্মণকে বাবা আর ব্রাহ্মণীকে মা বলে সম্বোধন করে জানায় যে পৃথিবীতে আপন বলতে তার কেউ নেই। সেই সাথে তাদের কাছে এই নিবেদন পেশ করে, যদি তারা তার ভরণপোষণের ভার নেয় তবে তাদের বাড়িতে মেয়েটি দাসীরূপে থাকবে। নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর স্বর্গের দেবীর মতো দেখতে মেয়েটিকে মনে ধরলো। তারা দুজনেই খুশিমনে তার প্রস্তাবটি গ্রহণ করলো।

সেদিন থেকে মেয়েটি তাদের বাড়িতে থাকতে শুরু করলো। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী মেয়েটিকে নিজেদের সন্তানের মতোই মমতা করতো। মেয়েটির দিনগুলোও বেশ ভালোভাবেই কাটতে থাকলো। এভাবে কেটে গেল এক বছর। তারপর এলো চৈত্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠীর দিন। দিনটিকে সামনে রেখে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী চাইলো তীর্থ ভ্রমণে যেতে। এ খবর শুনে মেয়েটিও বায়না ধরলো তাদের সাথে তীর্থযাত্রা করার অনুমতির জন্য। কিন্তু তারা

কোনোভাবেই রাজী হলেন না। শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে রাজী করাতে ব্যর্থ হলে মেয়েটি কয়েকটা গাঁদা এনে তুলে দিলো ব্রাহ্মণের হাতে আর বলল, গঙ্গা যখন যাচ্ছেন তখন এই ফুলগুলো নিয়ে যান। আমার নাম করে মাকে নৈবেদ্য দিয়ে আসবেন। মেয়েটির দেওয়া ফুলগুলো ব্রাহ্মণী তার শাড়ির আঁচলে বেঁধে নিলো।

শুরু হলো তাদের ভ্রমণ। চার রাতের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তারা পৌঁছল ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে। তিথি অনুযায়ী যাবতীয় রীতিনীতি সম্পন্ন করে নদীতে গোসল করে পূজা শেষ করলো তারা। ততক্ষণে মেয়েটির দেওয়া ফুলের কথা তারা ভুলে গেছে। বাড়ি ফেরার সময় ব্রাহ্মণী তার শাড়ির আঁচলে ফুলগুলো বাঁধা দেখেই মনে পড়লো মেয়েটির কথা। তখন সে শাড়ির আঁচল থেকে ফুলগুলো খুলে স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে নদীতে দিয়ে আসতে বললেন।

ব্রাহ্মণ বিষয়টাকে বেশ অবজ্ঞাভরে দেখছিল। তাই সে ফুলগুলে নদীর পানিতে ছুড়ে দিলো। আর তখনই ঘটলো অদ্ভুত ঘটনাটি। ব্রাহ্মণ দেখলো, ফুলগুলো ছুড়ে দিতেই নদীর জলের ভেতর থেকে কে যেন দুটো হাত বাড়িয়ে ফুলগুলো গ্রহণ করলো।

ঘটনাটা ব্রাহ্মণকে বিস্মিত করলো। স্ত্রীকে এসে ঘটনাটা খুলে বলল। এরপর তড়িঘড়ি করে ছুটল বাড়ির উদ্দেশ্যে। বাড়িতে ফিরে মেয়েটি 'তুমি কে?' জিজ্ঞাসা করে যেই মাত্র প্রণাম করতে যাবে, অমনি মেয়েটি পেছন দিকে ছুটলো। মেয়েটিকে ছুটতে দেখে ব্রাহ্মণও তার পিছু নিলো। চৌগঙ্গা থেকে ছুটতে থাকলো হোসেনপুরের দিকে, যেখানে রয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদ। ছুটতে ছুটতে শেষমেশ যখন ব্রহ্মপুত্রের নিকট পৌঁছল, তখন মেয়েটি যেন নদের পানিতে মিশে গেল। কথিত আছে, মেয়েটি যে পথ ধরে ব্রহ্মপুত্রের দিকে ছুটে গিয়েছিল, সেই পথের সমস্তটা মেয়েটি ব্রহ্মপুত্রের জলে মিলিয়ে যাওয়ার পর নদীতে পরিণত হলো। জানা যায়, সেই কিশোরী মেয়েটির নাম ছিল সন্ধ্যা। আর নতুন সৃষ্ট নদীটির নাম হলো নরসুন্দা।

।। ৩. অচিন গাছ।।

কিশোরগঞ্জ জেলার তৃতীয় যে কিংবদন্তীটি এখন বলবো সেটি কোনো পুরোনো বনিয়াদি বাড়ি বা জলাশয়কে কেন্দ্র করে নয়, বরং একটি অদ্ভুত গাছকে কেন্দ্র করে। কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া থানার অন্তর্গত চরফরাদী

ইউনিয়নাধীন, মির্জাপুরের উত্তরে অবস্থিত চরকাহে ধান্দুল গ্রামটি। এই গ্রামটিতেই ছিল আমাদের গল্পের সেই গাছটি। স্থানীয়রা গাছটির নাম দিয়েছিল অচিন গাছ। সুপ্রাচীন এই গাছটি আকারেও ছিল বেশ বড়োসড়ো। লম্বায় প্রায় আকাশ ছুঁই ছুঁই। গাছটি কীভাবে জন্মালো তাও কেউ বলতে পারে না।

গাছটিকে নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে আছে জনশ্রুতি। কেউ কেউ বলে গাছটিতে নাকি জ্বীনদের বসবাস ছিল। রাতের বেলায় গাছটির আশেপাশে কেউ তেমন একটা যেতেও চায় না। যতটা সম্ভব এড়িয়ে যেতে চাইতো সবাই। শোনা যায়, গাছটি থেকে নাকি রাতে অনেক সময় রংবেরঙের আলো বিচ্ছুরিত হতে দেখা যেত। স্থানীয়রা মতে এই আলোগুলো সাধারণ কোনো আলো নয়, ওগুলো আসলে জ্বীনদের আলো। আর কেউ কেউ গাছটির ভেতর থেকে সোঁ সোঁ শব্দ শুনতে পাওয়ার দাবীও করেছে।

স্থানীয়দের কাছে গাছটি সত্যিকারার্থেই রহস্যজনক।

।। ৪. বাক্সবিলের জনশ্রুতি ।।

বহুকাল আগে কিশোরগঞ্জ শহরের উত্তর দিকে, আনুমানিক প্রায় দুই মাইল দূরে একটি বিল ছিল। বিলটির নাম ছিল বাক্সবিল। এমন নামকরণ নিয়ে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত। শোনা যায়, তখনকার সময়ে সারা বছরজুড়েই বিলটিতে সাঁতার কাটার মতো পানির সরবরাহ থাকতো। বিলটির এক স্থানে ছিল একটা কুঁড় বা বড়ো গর্ত। স্থানীয়দের কাছে কুঁড়টি ছিল অশুভ মনে। তারা মনে করতো কুঁড়টি প্রকৃতপক্ষে একটা ডুবি। শুধু তাই নয়, তারা আরো ধারণা করতো যে ডুবিটিতে বসবাস করে নানারকমের সব অদ্ভুত জীবজন্তু। পারতপক্ষে লোকে সেটিকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতো।

সেই সময়কার কোনো এক বর্ষার ঘটনা। গাঁয়ের একদল ছেলেপিলে বিলের পাড়ে গিয়েছিল গরু চড়াতে। গরু চড়ানোর এক পর্যায়ে তারা মেতে উঠলো গ্রাম্য সব খেলাধুলায়। খেলতে খেলতে ছেলেগুলো একসময় বিলের পানিতে নামলো। আর তখনই ঘটলো বিপত্তি। একসময় ছেলেগুলোর মধ্যকরা একটা ছেলে আবিষ্কার করলো তার পায়ের সাথে একটা চকচকে শিকল জড়িয়ে আছে। যেই সেই শিকল ছিল না, বরং ওটা একেবারের চকচকে সোনার শিকল। যা হোক, ছেলেটা চেষ্টা করলো পা থেকে শিকলটা ছাড়িয়ে নিতে। কিন্তু কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারলো না। সেই সময়

বিষয়টা অন্যান্য ছেলেপিলেগুলোর দৃষ্টিতে এলো। ওরাও চেষ্টা করলো। তবে শেষ পর্যন্ত যখন কোনো লাভ হলো না তখন তারা গ্রামে ফিরে গিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে খুলে বলল পুরো ঘটনা। মুহূর্তের মধ্যে গোটা গ্রামজুড়ে ছড়িয়ে পড়লো খবরটা।

অন্যদিকে ঘটনার ব্যাপারে অবগত হওয়া মাত্রই গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠরা ছুটে গেল বিলের সেই জায়গাটায়। গিয়ে দেখলো, ছেলেটি তখনো নিজের পা থেকে শিকলটি ছাড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারাও চেষ্টা করলো শিকলটা পা থেকে খোলার, কিন্তু বলাই বাহুল্য তাতে কোনো লাভ হলো না। ততক্ষণে পুরো ঘটনা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। এসে পড়েছে কামারের দলও। তারাও চেষ্টা করলো নিজেদের মতো করে শিকলটা কাটার। কামারেরা ব্যর্থ হলে গ্রামবাসীরা নিজেদের মতো দা, কুড়োল দিয়ে চেষ্টা করলো। তাতেও লাভ হলো না। তখন সবাই মিলে শিকল ধরে টানতে শুরু করলো। যতই টানে ততই পানির নিচ থেকে শিকল উঠে আসে। সবকিছু যখন ব্যর্থ হলো তখন ছেলেটিকে তার বাবা-মা ঐ অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে গেল।

ওভাবেই কেটে গেলো আরো সাত দিন, সাত রাত। অবশ্য এই সাত দিন সাত রাত যে একেবারে বসে বসে কেটেছে সবার তা কিন্তু নয়। বরং সাতদিন ধরে সবাই শিকল টানলো। কিন্তু শিকল শেষ হওয়ার কোনো নাম নেই। বাড়িঘর ভরে উঠলো সোনার শিকলে। অন্যদিকে চলল শিকল কাটার কাজ। কিন্তুবিলের পানির নিচ থেকে না শিকল ওঠা শেষ হলো, না গেল কাটা। শেষমেশ সবাই হাল ছেড়ে দিলো।

এদিকে সাত দিন পর, রাতের বেলায় বাবা-মা স্বপ্ন দেখলো কেউ তাদের উদ্দেশ্যে বলছে, "তোমাদের ছেলেটাকে আমাকে দিয়ে দাও, তাতে তোমাদের ছেলের জন্যই মঙ্গলকর হবে। এর অন্যথা হলে তোমাদের ছেলে তো মরবেই সেই সাথে চিরতরে নির্বংশ হয়ে যাবে তোমরা। তাই ছেলেটিকে বিলের ধারে রেখে আসো।"

এমন কঠিন স্বপ্নাদেশ পেয়ে ছেলেটির বাবা-মা কান্নাকাটি জুড়ে দিলো। শেষমেশ ছেলেটির মঙ্গলের কথা চিন্তা করে তারা তাকে বিলের ধারে রেখে এলো। সেই রাতে ওখানকার অধিবাসীরা শুনতে পেল বিলের ধার থেকে অদ্ভুত বাজনা শব্দ ভেসে আসতে শুনলো। শুধু তাই নয়, ডুবিতে হরেক রঙের আলোও দেখতে পাচ্ছিল তারা।

পরের দিন সকালে লোকেরা দেখলো যে ছেলেটিকে যেখানে রেখে যাওয়া হয়েছিল সেই জায়গাটি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। এমনকি শিকলেরও কোনো অস্তিত্ব নেই।

এই ঘটনার পর কেটে গেল তিন মাস। হঠাৎ ছেলেটির বাবা-মা আবারো স্বপ্ন দেখলো। স্বপ্নে তাদেরকে বলা হলো যদি তারা তাদের ছেলেকে দেখতে চায় তবে তারা যেন একটি ঘর পাকসাফ করে রাখে। মাঘী পূর্ণিমার রাতে শুধুমাত্র এক রাতের জন্য তারা তাদের ছেলেকে দেখতে পাবে। কথামতো নির্ধারিত দিনে ছেলেটির জন্য বিলের ধারে একটা ঘর পাকসাফ করে রাখা হলো। স্বপ্নের ঘটনা গ্রামজুড়ে ছড়িয়ে পড়লো। সেদিন সন্ধ্যা নামার আগেই গ্রামের লোকেরা জড়ো হলো বিলের ধারে। সন্ধ্যা নামার পর তারা দেখল, ডুবি থেকে ভেসে আসছে অদ্ভুত সুন্দর সেই বাজনা যা তারা তিনমাস আগে শুনেছিল। সেই সাথে দূরে নানারকমের আলো জ্বলতেও দেখা যাচ্ছে। আলোটা যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে পাড়ের দিকে। কাছাকাছি এলে পড়ে সবাই দেখলো বিলের পানির ওপর সাতটি বাক্স ভেসে আছে সাতটি বাক্স। বাক্স সাতটির মাঝখানেরটির ওপরে বসে আছে সেই ছেলেটি। আর বাক্সগুলোর গায়ে জ্বলছে লাল-নীল আলো।

শেষমেশ পাড় থেকে খানিকটা দূরে ছেলেটিকে নামিয়ে দিয়ে বাক্সগুলো পুনরায় তলিয়ে গেল পানির তলায়। ছেলেটি গিয়ে উঠলো সেই পাকসাফ করে রাখা ঘরটিতে। সেই রাত সে সেখানেই অবস্থান করলো। লোকদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা হলো, কিন্তু এতদিন কোথায় ছিল সে বিষয়ে মুখ খুলল না। রাত শেষে যখন আবার শিকলে টান পড়লো, ওমনি ছেলেটি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিলের ধারে এগিয়ে গেল। উপস্থিত সবাই দেখলো বাক্স সাতটি পুনরায় বিলের ধারে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। ছেলেটি মাঝের বাক্সটির ওপরে গিয়ে বসতেই সেগুলো আবার ডুবির দিকে যাত্রা করলো। কিছুক্ষণ পরে ছেলেটিকে নিয়ে পানির নিচে হারিয়ে গেল।

কথিত আছে সেই দিনের পর ছেলেটি আর কখনো ভেসে উঠেনি পানির তলা থেকে। এমনকি বাক্সগুলোও নয়। কিন্তু সেদিনের পর থেকে লোকে বিলটিকে বাক্সবিল নামে সম্বোধন করতে শুরু করলো।

।। ৫. পাগলা মসজিদ ।।

এই জেলার বিখ্যাত একটি মসজিদ হলো পাগলা মসজিদ। মসজিদটি উৎপত্তি নিয়ে একটি গল্প শোনা যায় স্থানীয়দের মুখে মুখে। জনশ্রুতি রয়েছে, একবার এক সাধক নরসুন্দা নদীর পানিতে মাদুর ভাসিয়ে সেটির ওপর আসন পেতে বসেন। বিস্ময়করভাবে মাদুরটি ডুবল না, বরং নদীর পানির ওপর

ভেসে রইলো। মাদুরটি নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে সাধকটিকে নিয়ে নদীর মাঝখানে, বর্তমানে যেখানে মসজিদটি অবস্থিত, সেখানে এসে পৌঁছলে স্থির হয়ে পড়ে।

সাধক ধ্যানে মগ্ন থাকা অবস্থাতেই ঐ স্থানে চর জেগে ওঠে। ঐসময় নদীতে একদল জেলে মাছ ধরছিল। তারা এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়ে পড়ে। এই ঘটনা দ্রুত চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে থাকলে সাধকের অনুসারী সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। অলৌকিক কেরামতির কারণে অনেকেই তার কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সাধকের শিষ্যরা সেই চরের মধ্যেই তাঁর জন্য একটি হুজরাখানা তৈরি করে দেন। পরবর্তীকালে সাধক মারা গেলে হুজরাখানার পাশেই তাকে দাফন করা হয়, আর হুজরাখানার স্থানটিতে স্থাপন করা একটি মসজিদ, যেটি পাগলা মসজিদ নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

।। ৬. কালীবাড়ির পাঁচালি।।

আজ থেকে প্রায় দুইশত বছরেরও বেশি আগের কথা। নরসুন্দা নদীটির অবস্থা এখনকার মতো করুণ ছিল না তখন। সেই সময় নদীটি ছিল যথেষ্ট সমৃদ্ধ। শহরের ভেতর দিয়ে প্রবাহমান নদীতে ছিল কুঁড়–যেখানে তৎকালীন সময়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। তেমনি একটি কুঁড়ের নাম ছিল মরকুমার কুঁড়, যেটি পরবর্তীকালে কালীর কুঁড় নামে পরিচিতি পায়। যদিও বর্তমানে খুঁজলে মরকুমার কুঁড় বা কালীর কুঁড় দুটোর কোনোটাই পাওয়া যাবে না। তবে কালের সাক্ষী হয়ে কিশোরগঞ্জের কালীবাড়ির কালী মন্দিরটি আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এই কালী মন্দির এবং মন্দিরটির প্রথম বিগ্রহটির সাথে মরকুমার কুঁড় তথা পরবর্তীকালের কালীর কুঁড়ের সম্পর্ক রয়েছে। মন্দির স্থাপন ও প্রথম বিগ্রহটিকে কেন্দ্র করে রয়েছে একটি কিংবদন্তী। যদিও তা আজ সেই কিংবদন্তীটিও কুঁড়ের সাথে সাথে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে।

বলা হয়ে থাকে, কিশোরগঞ্জ কালীবাড়ির কালী মন্দিরটি অষ্টাদশ শতকের গোঁড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত। আগেই বলেছি মন্দির প্রতিষ্ঠার পেছনের একটি কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে। কথিত আছে, সেই সময় চৈত্র-বৈশাখ মাসের দিকে জেলেরা নরসুন্দা নদীর মরকুমার কুঁড়ে মাছ শিকার করতো। মাছও পাওয়া যেত প্রচুর। কিন্তু এক বছর কুঁড়ে পর্যাপ্ত মাছ থাকা সত্ত্বেও

জেলেদের কারোর জালেই কোনো মাছ ধরা পড়লো না। জেলেরা বার বার চেষ্টা করলো। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হলো। শেষ পর্যন্ত এভাবেই কেটে গেল মাছ ধরার মৌসুমটি। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকল পরবর্তী কয়েক বছরের মাছ ধরার মৌসুমগুলোতেও। কোনোপ্রকারেই অবস্থার কোনো উন্নতি হলো না। কোনো মাছই আর যেন ধরা দিচ্ছিল না জেলেদের জালে। মাছগুলো যেন হঠাৎ করেই বুদ্ধিমান হয়ে গিয়েছিল। একটা সময় হাল ছেড়ে দিয়ে উক্ত কুঁড়েটিতে মাছ ধরাই বাদ দিলো স্থানীয় জেলেরা।

একদিন লোকেরা দেখল রাতের বেলা কুঁড়ের পানিতে লাল-নীল আলো জ্বলছে। দেখে মনে হচ্ছিল, কিছু একটা যেন কুঁড়ের পানিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আরো কিছুকাল পরের ঘটনা। একবার এক জেলে ভীষণ অভাবে পড়লো। ঘরে ক্ষুধা নিবারণ করার মতো কোনো খাবার নেই। সহসা তার মনে হলো কুঁড়ের কথা, যেখানে অনেকদিন ধরে মাছ ধরা বন্ধ আছে। ভাবল, জাল ফেলে দেখবে কোনো মাছ পাওয়া যায় কিনা, তাতে অন্তত একবেলার খাবারের সংস্থান হলেও হতে পারে।

সন্ধ্যার কিছু আগে জেলেটি জাল নিয়ে মরকুমার কুঁড়ে গেল মাছ ধরার উদ্দেশ্যে। পর পর দুবার জাল ফেলে কোনো মাছ পাওয়া গেল না। আশাহত মন নিয়ে আরেকটু সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে তৃতীয়বারের মতো জাল ফেলল। কিছুক্ষণ পর যখন জাল টানলো, দেখলো জাল আর ওপরের দিকে উঠছে না। অনেক চেষ্টাচরিত করেও কোনো লাভ হলো না। পানির নিচ থেকে শক্তিশালী কিছু একটা যেন জালটাকে ধরে রেখেছে শক্ত করে।

জালের দড়িটা খুঁটির মতো কিছু একটা সাথে বেঁধে লোকালয়ে ফিরে এলো সে। সঙ্গে করে কয়েকজন লোক নিয়ে কুঁড়ে ফিরে এলো পুনরায়। সবাই মিলে যখন আবার জাল টানলো তখন পানির নিচ থেকে বুদবুদ উঠতে লাগলো, কিন্তু জাল আগের মতোই অনড় রইলো। কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও যখন সফল হলো না, তখন জালের দড়ি খুঁটির সাথে বেঁধে রেখে জাল ছেড়ে দিলো। ধীরে ধীরে জালের বাকিটাও তলিয়ে গেল পানির নিচে।

ব্যাপারটা দেখে সবাই বেশ ভয় পেলো। জাল ওভাবে ফেলে রেখেই ফিরে গেল বাড়ি।

পরেরদিন রাতে জেলে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলো। স্বপ্নের মধ্যে তাকে জানালো হলো, যদি সে তার একমাত্র ছেলে কানাইকে কুঁড় থেকে জাল তুলতে পাঠায় তাহলেই কেবল জাল তুলতে পারবে। আর যদি না পাঠায় তাহলে নির্বংশ হয়ে যাবে।

স্বপ্নটি দেখে জলে ভীষণ ঘাবড়ে গেল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল

না। ভীত জেলে এক পর্যায়ে নিজের কৃতকর্মের জন্য কাঁদতে শুরু করলো। এদিকে জেলের ছেলেটি সব ঘটনা জানতে পেরে বলল যে সে কুঁড় থেকে জাল তুলতে যাবে। ছেলের কথা শুনে প্রথমে তার বাবা তাকে যেতে দিতে রাজী হলো না। কিন্তু সেসব কথা তোয়াক্কা না করে কানাই পরদিন একটা ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে চলে গেল জাল তুলতে।

ছেলেটি জালে হাত দেওয়া মাত্রই সেটি যেন আপনাআপনি জল থেকে উঠে আসতে শুরু করলো। কোনো কষ্টই হলো না তার। সে যখন জাল ডিঙ্গির ওপর তুলল, দেখলো জালের ভেতর সুন্দর কারুকার্য সম্বলিত পাথরের তৈরি কালী মূর্তি রয়েছে। মূর্তিটির সর্বাঙ্গ দামী অলংকারাদিতে সজ্জিত। খবরটা সর্বত্র ছড়ানো মাত্রই স্থানীয় লোকেরা সমবেত হতে শুরু করলো সেখানে। তারা ভক্তিভরে মূর্তিটিকে জাল থেকে বের করে কুঁড়ের কাছে থাকা একটি বৃক্ষের তলায় স্থাপন করে, যেটি বর্তমান কালীবাড়ি থেকে উত্তরদিকে ছিল।

কালীর বিগ্রহ পাওয়া যাওয়ায় মরকুমার কুঁড়ের নাম হলো কালীর কুঁড়।

জলের তলায় পাওয়া বিগ্রহটি বাংলা ১৪০৩ সনে চুরি হয়ে যায়। পরে কিছুদিন মাটির বিগ্রহ দিয়ে পূজাকার্য সক্রিয় রাখা হয়। পরে বড়োবাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী স্বর্গীয় নারায়ণ চন্দ্র সাহা কর্তৃক বিগ্রহটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়।

বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই এ মরকুমার কুঁড় বা কালীর কুঁড় সম্পর্কে অবগত নন। সেটি কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে চিরকালের মতো।

জমিদার বাড়ির কথকতা

ফার্সি শব্দ যামিন অর্থ জমি বা ভূ-সম্পত্তি। দোস্তান অর্থ ধারণ বা মালিকানা। যামিন শব্দটির সাথে ফার্সি দোস্তান শব্দের বাংলা অপভ্রংশের 'দার' যুক্ত হয়ে 'যামিনদার' শব্দের উৎপত্তি হয়, যা থেকে পরবর্তীকালে জমিদার শব্দটিকে পাই আমরা। জমিদারদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হ্যারিংটন বলেছেন, "...রাষ্ট্রপক্ষের রায়ত ও জমির উপস্বত্বভোগীদের কাছ থেকে যারা রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পালন করে থাকে, তারাই জমিদার। এজন্য সম্রাটের কাছ থেকে সনদ নিতে হয় এবং সম্রাটকে পেসকশ ও প্রাদেশিক নাজিমকে নজরানা প্রদান করতে হয়।" মধ্যযুগ থেকে বাংলার অভিজাত শ্রেণির ভূস্বামীদের উপাধি হিসাবে এটির ব্যবহার শুরু হয় বলেও মনে করা হয়। অবশ্য সম্রাট আকবরের আমলে এসে টোডরমল কর ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেন। তার আওতায় জমিদারেরা লাভ করলেন নতুন ভূমিকা। জমিদারদের কাজ ছিল সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে কর সংগ্রহ করা। জমিদারদের কিন্তু তখন জমিদার বলা হতো না, বলা হতো জায়গীরদার।

যদিও বাংলায় আবার জমি বিলি ব্যবস্থার নিয়ম ছিল আলাদা। জমিদারদের হাতেই ছিল প্রভূত ক্ষমতা। জমিদার পদবি বা শব্দটি ভূঁইয়া বা ভূপতির দেশীয় পারিভাষিক শব্দের সরাসরি প্রতিশব্দ বলা যায়। এই ভূঁইয়া বা ভূপতিরা ছিল প্রাক-মোগল শাসনামলের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারসূত্রে জমির মালিক। মোগল আমলে বাংলার স্বাধীনচেতা ভূঁইয়াদের সাথে সম্রাটের প্রায়শ লড়াই লেগেই থাকতো। এসব আমরা ইতিহাসের বইতে পাই। শেষমেশ বহু কষ্টে ভূঁইয়াদের পরাজিত করে মোগলরা। সেই সাথে নতুন করে জমিদারি প্রথা সংস্কার করে তারা। তারপর একসময় গিয়ে রাজনীতির হাওয়া বদলে এদেশ চলে যায় ইংরেজদের হাতে। দেশের শাসন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ইংরেজরাও এসব বিষয়ে ব্যাপক সংস্কার করে। এর ধারাবাহিকতায় তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশ "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" নামে ১৭৯৩ সালে জায়গিরদারি প্রথা বিলুপ্ত করে জমিদারী প্রথা চালু করেন। যার ফলে এটি "জায়গিরদারি" প্রথা থেকে "জমিদারী" প্রথায় রূপ নেয়। জমিদারিগুলো হাত বদল হতে থাকে রাতারাতি। বাংলাদেশের

আনাচেকানাচে তৈরি হতে থাকে নতুন নতুন জমিদার। প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে সেটির একাংশ আবার দিতে হতো সম্রাট কিংবা কোম্পানিকে। এমন পরিস্থিতিতে পড়ে যেমন অনেকে কঠোর হয়েছেন, তেমনি অনেকে হঠাৎ ক্ষমতা পেয়ে তার অপব্যবহার করতেও পিছপা হননি।

আমাদের দেশের যেসব জমিদার বাড়ি রয়েছে খেয়াল করলে দেখা যায় সেগুলোর বেশির ভাগের মধ্যেই রয়েছে রোমান ও গ্রিক স্থাপত্যের ছাপ- গোলাকার বিশাল থাম, কারুকার্যেও ভিনদেশি ছাপ লক্ষণীয়, প্রবেশদ্বার কিংবা মহলের চূড়ায় সিংহ প্রতীক। এখানে একটা বিষয় খেয়াল করা যায়, মোটামোটি বেশিরভাগ জমিদারদের ইতিহাস দু'শ-আড়াই'শ বছরের পুরোনো। কোনো কোনো জমিদার পরিবারের ইতিহাস এরচেয়েও অনেক পুরোনো, তবে সেই সংখ্যাটা আবার তুলনামূলকভাবে কম।

এদেশের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য জমিদার বাড়ি, কিন্তু সেগুলোর প্রায় সবগুলোই এখন ভগ্নপ্রায় অবস্থা। দেশভাগের সময় অনেক জমিদার দেশ ছেড়ে চলে যান, অনেকেই আবার দেশভাগের আগেই হয়েছেন দেশান্তরী। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হবার পর কালের গর্ভে জমিদাররা হারিয়ে গেলেও তাদের নির্মিত সুরম্য ভবনগুলো বা সেসবের ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেছে স্বস্থানে। সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়া জমিদার বাড়িগুলোর দীর্ঘশ্বাসের সাথে ঘুরে বেড়ায় কত গল্প, কত ইতিহাস। বইয়ের এ অংশে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই তেমনি কিছু জমিদার বাড়ির কিংবদন্তীর সাথে।

।। ১. লকমা জমিদার বাড়ি (পাঁচবিবি, জয়পুরহাট) ।।

জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলা সদর থেকে পশ্চিমে, আট কিলোমিটার দূরে আয়মারসুলপুর ইউনিয়নাধীন কড়িয়া গ্রাম। এই গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে দেখতে পাওয়া যায় ধ্বংসস্তুপ। একসময় এটিই ছিল 'লকমা জমিদার বাড়ি'। স্থানীয়রা বলে 'চৌধুরী বাড়ি'।

লকমার জমিদার বাড়ির গোড়াপত্তনকারী ছিলেন জমিদার হাদী মামুন চৌধুরী। ১৫০০-১৬০০ সালের দিকে নির্মিত হয়েছিল বাড়িটি। তিন একর জায়গাজুড়ে নির্মিত এই জমিদার বাড়িটি ছিল দুই ভাগে বিভক্ত। প্রাসাদটি মূলত তিন তলাবিশিষ্ট ছিল। ইংরেজদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের যাতাকলে বাংলার অসংখ্য জমিদারি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে কিছু

ব্যতিক্রমও রয়েছে–ইংরেজদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রণয়নের অনেক আগেই অনেক জমিদারি ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তার অন্যতম নিদর্শন হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশের উত্তরাংশের এই 'লকমা জমিদার বাড়ি'। এই জমিদার বাড়িটির ধ্বংসের কারণ হিসেবে দুটি কিংবদন্তী প্রচলিত, যা আজও এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের মুখে শোনা যায়।

কথিত আছে–লকমার জমিদার বাড়ির অধিকাংশ বাসিন্দারা ছিল তুলা রাশির জাতক। তুলা রাশির জাতকদের সম্বন্ধে গ্রামবাংলায় আরো একটি জনশ্রুতি রয়েছে। বলা হয়, তুলা রাশির অধিকারী ব্যক্তিদের নাকি অতিপ্রাকৃত কিছু শক্তি থাকে। এই অতিপ্রাকৃত শক্তিকে গ্রামবাংলার লোকেরা বলে 'ভর ওঠা'। মনে করা হয়, বিশেষ কিছু আচার ব্যবহার পালন করার মধ্য দিয়ে তুলা রাশির লোকেদের হাতে ভর উঠে। কোনো ব্যক্তির হাতে ভর উঠলে হাত কাঁপতে শুরু করে। কাঁপতে থাকা হাত তখন ঐ ব্যক্তিটিকে মাটির নিচে গচ্ছিত রাখা গুপ্তধনের দিকে অলৌকিকভাবে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। লোকে বলে, গভীর রাতে খুব গোপনে এই পন্থায় গুপ্তধন তুলে এনে লুকিয়ে রাখা হতো জমিদার বাড়ির একটি গোপন কক্ষে। এভাবেই নাকি প্রচুর ধনরত্নের মালিক হয়েছিল লকমা জমিদার পরিবার। এই সুবিশাল ধনরাজির পাশাপাশি সবার অগোচরে চলে আসে দীর্ঘশ্বাসেরা।

গুপ্তধন সম্পর্কে সেই সময়কার প্রচলিত বিশ্বাসগুলোর মধ্যে একটি বিশ্বাস ছিল এরূপ : মনে করা হতো, মাটির নিচে পুঁতে রাখা গুপ্তধনগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদানের যক্ষ। গুপ্তধনের মালিক বা বৈধ উত্তরাধিকারী ব্যতীত অন্য কেউ যদি অবৈধভাবে তা সংগ্রহ করতে চায়, তাহলে তার পরিবার নির্বংশ হয়ে যায় যক্ষের হাতে।

অন্যের লুকিয়ে রাখা ধনসম্পদ দিয়ে ধনীতে পরিণত হওয়া লকমা জমিদার পরিবারে একদিন যক্ষের অভিশাপ পড়লো। সর্পরূপী যক্ষ আস্তানা গাড়লো জমিদার বাড়িতে। তারপর থেকেই শুরু হলো সাপের উপদ্রব। জমিদার বাড়ির এখানে সেখানে ভরে উঠলো সাপে। সর্বত্র লকলকে জিহ্বা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো বিষাক্ত সাপেরা। জেনানা মহলে উপদ্রব হতো সবচেয়ে বেশি। যক্ষের অভিশাপের দ্বিতীয় ধাপে, বংশের পুরুষেরা একে একে পাগল হতে লাগলো। অবশিষ্ট বংশধরেরা মূল বাসভবন ছেড়ে মসজিদের পাশে ঘর বাঁধলো, কিন্তু তারপরেও সাপের উপদ্রব থেকে রেহাই মিললো না। শেষমেশ চৌধুরী পরিবার বাস্তুভিটা ত্যাগ করে বহুদূরের গ্রামে বসবাস শুরু করলে নিস্তার পায় সাপের হাত থেকে।

লকমা জমিদার বাড়ি নিয়ে আরো একটি কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে।

ইতিহাসের অধিকাংশ জমিদারই যে অত্যাচারী ছিল তা আর নতুন করে বলে দিতে হয় না। কিন্তু লকমা জমিদার বংশ ছিল তাদের চেয়েও এককাঠি সরেস। তাদের জমিদারিত্বে না ছিল ন্যায় বিচার, না ছিল প্রজাদের মুখে হাসি। অন্যায়ভাবে সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠতে লাগলো জমিদার বাড়িতে। গোটা এলাকার বাসিন্দারা জমিদারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। একদিন গভীর রাতে লকমা পরিবারের সবাই শুনলো দৈববাণী, "এই এলাকা ছেড়ে চলে যা, নইলে বিপদ।" সকাল হতেই জমিদার পরিবার দৈববাণীর কথা হেসে উড়িয়ে দিলো। কিন্তু আরো দুইদিন শোনা গেল একই দৈববাণী, ঐ একই কথা-"এই এলাকা ছেড়ে চলে যা, নইলে বিপদ।" পরের দিনই বিপদের নমুনা বোঝা গেল। সাপে ছেঁয়ে গেল গোটা জমিদার বাড়ি। কোত্থেকে যে আবির্ভূত হলো সাপগুলো তা কেউ বলতে পারলো না। বাড়ির আনাচেকানাচে ছড়িয়ে রয়েছে শ'য়ে শ'য়ে সাপ। শেষমেশ সাপের ভয়ে লকমা জমিদারেরা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অতি দ্রুত এলাকা ছেড়ে গ্রামে গিয়ে বসবাস শুরু করলো। এভাবেই বিলুপ্ত হলো অত্যাচারি লকমা জমিদারি। সময়ের ক্রমাগত ছোবলে একসময়কার সুরম্য প্রাসাদ ধীরে ধীরে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে একতলা ভাঙাচোরা ভবনে, যা এখনো কালের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে।

।। ২. কাইতলা জমিদার বাড়ি (নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া)।।

আঠারো'শ শতাব্দীর শুরুর দিকে ভারতের আগরতলা জমিদার বাড়ির আদলে ২.২৮ শতাংশ জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় কাইতলা জমিদার বাড়ি। বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী মুঘল আমলে ভারতের শিম গাঁও থেকে পাড়ি জমিয়েছিলেন এই বাংলায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগরে স্থাপন করেন বসতি। ইংরেজ আমলে কাইতলার জমিদারেরা যথেষ্ট সমীহ পেতেন। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারিত্ব খারিজ হয়ে যায় কাইতলার।

কাইতলা জমিদার বাড়ির ধ্বংসস্তূপ পাশ কাটিয়ে গেলে দেখতে পাওয়া যায় একটি পুকুর। কালো কুচকুচে পানি সমৃদ্ধ পুকুরটি আপনাকে একটা শিরশিরে অনুভূতি দিতে বাধ্য। পুকুরটির নাম আন্দা পুকুর। কেউ কেউ আন্ধা পুকুর বলেও সম্বোধন করে। জমিদার বাড়ির এই পুকুরটিকে ঘিরে প্রচলিত রয়েছে কিংবদন্তী।

কাইতলা জমিদার বাড়ির অবস্থা যখন রমরমা ছিল তখন অঢেল

সম্পত্তি, মূল্যবান স্বর্ণালংকার ও হীরা-জহরত তামার ঘটে ভরে পুকুরের জলের তলায় ডুবিয়ে রাখা হতো। সেই ঘটগুলো নাকি মাঝেমধ্যে পুকুরের তলা থেকে ভেসে উঠত। এই পুকুরে নাকি একসময় সিন্দুকও ভেসে উঠতো নিয়মিত। রাত করে এক পুকুর থেকে ঐ পুকুরে যাওয়া আসা করতো সোনা-রূপা আর হীরা-জহরত ভর্তি তামার ঘটগুলো। এই সেই আন্দা পুকুর। শতবর্ষ পার করে এলেও এখনো সংস্কার করা সম্ভব হয়নি আন্দা পুকুর। কারণ, এখনো নাকি পুকুরে গিজগিজ করে সাপ। লোকে বলে, তারা জমিদারের লুকিয়ে রাখা ধনসম্পদের পাহারাদার এরা।

এই অলৌকিক কিংবদন্তীর পাশাপাশি কাইতলার জমিদারেরাই ছিলেন লৌকিক কিংবদন্তী। প্রজা নিপীড়নে উনারা ছিলেন অদ্বিতীয়। খাজনা আদায় হতো হাতির মাধ্যমে। জমিদারের হুকুম মতো কাজ না করলে শাস্তি হতো ভয়ঙ্কর উপায়ে। জমিদার বাড়ির সামনে দিয়ে কেউ জুতা পায়ে, ছাতা কিংবা টুপি মাথায় দিয়ে যাওয়ার ওপরেও ছিল নিষেধাজ্ঞা (সেই আমলে জুতার চলই ছিল কম)। নববধূ পালকিতে করে জমিদার বাড়ি ঘেঁষে যাওয়া ছিল কল্পনাতীত। অবশ্য জমিদারি বিলুপ্ত হওয়ার আগেই এই অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছিল প্রজারা। কারণ জমিদার বংশের পরবর্তী প্রজন্ম ছিলেন প্রজাদরদী।

।। ৩. শ্রীফলতলী জমিদার বাড়ি (কালিয়াকৈর, গাজীপুর) ।।

প্রায় দু'শ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয় গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় শ্রীফলতলী জমিদার বাড়ি। কালিয়াকৈরে ইতিহাসের বহু নিদর্শন বিদ্যমান। এই ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে শ্রীফলতলী জমিদার বাড়ি অন্যতম। পাশাপাশি দুটি অংশ নিয়ে জমিদার বাড়ির অস্তিত্ব–একটি বড়ো তরফ, অপরটি ছোটো তরফ।

মোগল আমলে বাংলার বিখ্যাত বারো ভূঁইয়াদের অন্যতম ছিলেন ভাওয়ালের গাজীরা। তারা ছিল চার ভাই–ফজল গাজী, কাশেম গাজী, সেলিম গাজী ও তালেব গাজী। এই বংশের তালেব গাজী ভাওয়াল গড়ের পাশাপাশি আলাদা করে শ্রীফলতলীতেও নির্মাণ করেন জমিদার বাড়ি, অন্তত ইতিহাস সেটাই বলে।

কিন্তু জমিদার বাড়ির কোথাও এর লিখিত প্রমাণ নেই যে এটি তালেব গাজীর নির্মিত জমিদার বাড়ি। ছোটো তরফের বাড়িটির প্রবেশ দরজায় লেখা

আছে, বিখ্যাত তালিবাবাদ পরগনার নয় আনা অংশ নিয়ে এই শ্রীফলতলী এস্টেট গঠিত। এই এস্টেটের প্রধান কর্ণধার খোদা নেওয়াজ খান। জমিদার বাড়ির কর্ণধার যেই হোন না কেন, বড়ো তরফের পরিত্যক্ত বাড়িটি নিয়ে রয়েছে একটি কিংবদন্তী।

জমিদার মানেই ধনসম্পদের প্রাচুর্যতা। বড়ো তরফেরও ধনসম্পদের কমতি ছিল না। নানা কারণে বড়ো তরফ দেশ ছেড়ে চলে যান। কিন্তু অঢেল সম্পত্তির সব তো আর নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই জমিদার পরিবার রাতারাতি সমস্ত অলংকার এবং মূল্যবান জিনিসপত্র বাড়ির বিভিন্ন দেয়াল ও মেঝেতে পুঁতে প্লাস্টার করে দিলেন। তারপর ভারী আসবাবপত্র সেভাবে রেখে তালা লাগিয়ে বিদায় নিলেন জমিদার বাড়ি থেকে। কালে কালে ধূলো জমতে জমতে জৌলুস হারাতে লাগলো জমিদার বাড়ি। তারপর হয়তো কোনো চোরের পা পড়ে এই বাড়িতে। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত আবিষ্কারই চোরেদের করা। সে যাই হোক, খুব খোঁজাখুঁজি চলল, মেঝে-দেওয়াল কিছুই বাকি রইলো না। মিললো না কিন্তু কিছুই। তারপর অনেকেই গুপ্তধনের আশায় খোঁজ চালাতে লাগলো কিন্তু সফলতা শূন্য।

লোকে বলে, এইসব ধনসম্পত্তি পাহারা দেয় বড়ো বড়ো সাপেরা। আর রাত হলে চোর-ছ্যাঁচড়দের দূরে রাখতে বাড়ি ভেতর থেকে ভেসে আসতে শোনা যায় নানারকম অদ্ভুত আওয়াজ।

রাতের বেলায় তাই কেউ সেদিকটাতে যেতে চায় না।

।। ৪. বামনডাঙা জমিদার বাড়ি (সুন্দরপুর, গাইবান্ধা) ।।

যুধিষ্ঠির-রূপ দেখি মুগ্ধ মৎস্যপতি।
সভাজন প্রতি চাহি কহে শীঘ্রগতি॥
এই যে পুরুষ আসে কন্দর্প-আকার।
ইহাকে কখন কেহ দেখেছ কি আর।
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য সম প্রভা কলেবর।
ঐরাবত সম গতি পরম সুন্দর।
কাঞ্চন পর্বত যেন ভূমে শোভা পায়।
আমার সভায় আসে, বুঝি অভিপ্রায়॥
(বিরাট পর্ব, কাশীদাসীর মহাভারত)

মহাভারত কাব্যের অন্যতম চরিত্র ছিলেন রাজা বিরাট। তিনি ছিলেন দয়ালু রাজা। তার রাজ্য জুড়ে ছিল অসংখ্য জলাশয়। জলাশয়গুলো সবসময় মাছে পরিপূর্ণ থাকতো। তাই তার নাম হয় মৎস্যরাজ। তার ছিল কুবেরের সমতুল্য ধনসম্পদ। ধনসম্পদের উৎস হিসাবে পেছনে ছিল তার অগণিত গরুর পাল। রাজা বিরাটের রাজ্য ছিল আমাদের দেশের উত্তরাংশের জেলা নীলফামারী, গাইবান্ধার বিস্তৃত এলাকাজুড়ে। রাজা বিরাট নিজেই কিংবদন্তী, আর তার রাজ্যে কিংবদন্তী থাকবে না তা কি হয়! গাইবান্ধা জেলার সুন্দরপুর উপজেলার বামনডাঙার কিংবদন্তী হয়ে আছে সুনীতি বালা দেবী। তাকে ঘিরে এ অঞ্চলে শোনা যায় নানা কিংবদন্তীর গল্প।

পনেরো শতকে সম্রাট আকবরের আমলে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত গৌড় বংশীয় ব্রাহ্মণ কৃষ্ণকান্ত রায় এ অঞ্চলে পালিয়ে আসেন। বিস্তৃত এলাকা নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন বামনডাঙা জমিদার বাড়ি। তার আমলেই বামনডাঙ্গার জমিদারদের নামডাক ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। কালের পরিক্রমায় জমিদারি পৃথক হতে থাকে। একসময় জমিদার হোন সুনীতি বালা দেবী। জমিদারি লাভের আগেই সুনীতি বালা দেবীর বিয়ে হয় দিনাজপুর জেলার ভাতুরিয়ার প্রিয়নাথ পাকড়াশীর সাথে। একদিন সুনীতি বালা দেবী একশ হাতি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে আসছেন। আসার পথে আলাইরপুরে একটি সেতু ভাঙ্গা অবস্থায় দেখতে পেলেন। একে তো বর্ষাকাল তার ওপর লোকসংখ্যা অনেক। এমনকি হেঁটে বা সাঁতরে এই নদী পার হওয়া হাতির পক্ষেও সম্ভব নয়। সবাই চিন্তিত মনে সুনীতি দেবীর কাছে এসে সকল বৃত্তান্ত জানালো। সবাইকে অভয় দিয়ে তিনি হাওদা থেকে নামলেন। হুকুম দিলেন তৎক্ষণাৎ সেতুর একটি কাঠামো তৈরি করতে। কাঠামোটি তৈরি হলে তিনি তার ওপর শালু কাপড় বিছিয়ে দিলেন। এরপর নিজে অগ্রগামী হয়ে সবাইকে নিয়ে নদী পার হলেন।

সুনীতি বালা দেবী ছিলেন এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত রায়ের মতোই ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ। গৃহদেবীর আশীবাদে তিনি জমিদার বাড়ি আরো সমৃদ্ধ করেন। কিংবদন্তী বলে সুনীতি বালা দেবীর একটি কামধেনু বা গাভী ছিল। কলাপাতায় করে সুনীতি বালা দেবী নিজ হাতে লবণ না খাওয়ালে দুধ দিত না। অনেকে বলতো এটি সাক্ষাৎ দেবীর গরু। সুনীতি দেবীর সেবা নিতে এসেছে। এছাড়া জমিদার বাড়িতে আছে বাবুর দিঘি ও নয়ার হাট নামে দুটি বড়ো জলাশয়। সুনীতি দেবীর আমলে নয়ার হাট দিঘিতে সারা রাত সোনার চালুন ভেসে থাকত আর বাবুর দিঘিতে ভেসে থাকতো বড়ো আকারের কালো পাথর। পাথর ভাসাকালে পানির রং হতো কুচকুচে কালো।

চালুন ও পাথরের ভয়ে এখনও দিঘিতে অনেকে নামতে সাহস করে না। এ অঞ্চলের বিখ্যাত দোল উৎসবে এই দিঘির বড়ো বড়ো মাছের চাহিদা প্রচুর।

।। ৫. ভাগ্যকুল জমিদার বাড়ি (শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ) ।।

এ জমিদার বাড়িটি খুব বেশি পুরোনো নয়, কারণ শ্রীনাথ রায়ের প্রথম তৈরীকৃত প্রাসাদটি বহু আগে পদ্মার বুকে স্থান নিয়েছে। আড়িয়াল খাঁ বিলে গিয়েও শ্রীনাথ রায়ের পুত্র যদুনাথ রায়ের হাতে তৈরি ভাগ্যকুল জমিদার বাড়িটির দেখা মিলবে। যদুনাথ রায় একটি নয়, এমন আরো চারটি প্রাসাদসহ মোট পাঁচটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন তার পাঁচ পুত্রের জন্য। কোনো উৎসবে যখন প্রাসাদগুলোতে আলো জ্বলে উঠতো, তখন তা ছিল দেখার মতো। সে রূপ বর্ণনা করেছিলেন অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ–"বিলের ধারে প্যারিস নগর"।

সাধারণত আমরা দেখি কোনো ধনী ভূস্বামী কিংবা ব্যবসায়ী সুযোগ বুঝে জমিদারিত্ব লাভ করেছে, কিন্তু ভাগ্যকুল পরিবার ছিল ব্যতিক্রম। ভাগ্যের জোরেই উনারা জমিদারিত্ব লাভ করেছিলেন। উনারা আগে ছিলেন কুন্ডু। ছোটোখাটো ব্যবসায় দিন চলে যেতো একরকম। বলতে গেলে প্রায় রাতারাতি জমিদার বনে যান এই পরিবারটি। এর পেছনে রয়েছে একটি দারুণ কিংবদন্তী।

জগতে নিরাকার নিরঞ্জন বস্তু হলেন নারায়ণ তার সহধর্মিণী হলেন লক্ষ্মী। রাজবাড়ির সবাই পদ্মারপাড়ে স্নান করতে যেতেন, তারপর সেখানকার কাশবনে গিয়ে কাপড় পাল্টাতেন। এটাই ছিল তখনকার নিয়ম। রাজবাড়ির এক রমণী স্নান করতে জলে নামলে তার পায়ে লক্ষ্মী শিলার ছোঁয়া লাগে। লক্ষ্মীর শিলা নড়াচড়া করলে প্রথমে ঐ রমণী ভয় পেয়ে যান। তারপর তার কাছে দৈব বাণী আসে, লক্ষ্মীকে রাজার দরবারে স্থান করে দেওয়ার জন্য। তিনি অন্য সবার সাথে পরামর্শ করে সুন্দর কারুকাজ করা লক্ষ্মী শিলাকে রাজার বাড়ি নিয়ে গিয়ে মন্দিরে স্থাপন করলেন। রাজা মহাশয় লক্ষ্মীকে যথাযথ সন্মান দিতে থাকেন এবং ব্রাহ্মণ গোত্রীয় একজনকে দেখাশুনা ও পূজা অর্চনার জন্যে পুরোহিত হিসেবে নিয়োগ দিলেন। দিনে দিনে রাজার প্রভূত উন্নতি ঘটতে লাগলো। এই রাজা ছিলেন ভালো মানুষ, ভালোভাবে রাজার কর্তব্য পালন করে বৃদ্ধ বয়সে দেহ রাখলেন। পরবর্তী রাজা রাজসিংহাসনে বসেই অত্যাচার ও দস্যুতা করে ধনসম্পদের পাহাড়

গড়তে লাগলো, রাজার নাম হয়ে গেল দস্যু রাজা। গৃহ দেবতা লক্ষ্মী-নারায়ণ এতে মনঃক্ষুন্ন হলেন তিনি তার পুরোহিতকে সংকেত দিলেন যে, তিনি আর এখানে থাকতে চান না। তাকে নৌকায় করে যেন পশ্চিমদিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এক শুভদিন দেখে পুরোহিত অত্যন্ত গোপনে লক্ষ্মীকে নৌকায় তুলে পদ্মা নদী দিয়ে চলতে লাগলো। ভাগ্যকুলের কাছে ফাতরা পাড়ায় আওয়াল নামক গ্রামে এলে লক্ষ্মী নৌকা থামাতে বললেন। সেখানে প্রেমচাঁদ কুন্ডু ও কেদারচাঁদ কুন্ডু নামক দুই ভাই বসবাস করতেন। ছোটোখাটো ব্যবসা করে দিন কেটে যেতো তাদের। পুরোহিত তাদের বললেন, রাজার বাড়ির শিলা তাদের বাড়ি থাকতে চান। রাজা যখন দস্যু, তখন কে না তাকে ভয় পায়! দুই ভাইও ভয় পেলো, কিন্তু অপূর্ব কাজ করা আর মাথায় তাজ দেয়া শিলা দেখে দুজনেই পুলকিত হলেন। তারা লক্ষ্মীর থাকার ব্যবস্থা করলেন নিজ বাড়িতে। এরপর লক্ষ্মী-নারায়ণকে বাড়িতে রেখে দু'ভাই তীর্থে বের হলো। সেখানেই তাদের মৃত্যু হয়। এদিকে লক্ষ্মী-নারায়ণ রয়ে গেল তাদের বাড়িতে। দু'ভাইয়ের সন্তানেরা বড়ো হয়ে কোম্পানির চাকুরি করতে লাগলো। ধীরে ধীরে সংসারের শ্রী বাড়তে লাগলো। একসময় লবণের ব্যবসা করে রাতারাতি প্রচুর ধন সম্পদের মালিক বনে গেলেন কুন্ডু পরিবার। এইসবের ফলশ্রুতিতে জমিদার হলেন শ্রীনাথ রায়।

শোনা যেত, তারা লক্ষ্মীকে গৃহবন্দী করে রেখেছিল, তাই তাদের উন্নতি কখনো থেমে থাকেনি। তাদের বাড়িতে লক্ষ্মী থাকতেন সোনার খাটে, আর তার পা থাকতো রূপোর খাটে। ভাগ্যকুলের জমিদারেরা লক্ষ্মী-নারায়ণের কথামতো প্রচুর দান-দক্ষিণা করতো। একদিন এক অশীতিপর বৃদ্ধ ভিক্ষুক জমিদার বাড়িতে হাজির হলেন। বহু অনুরোধ করেও জমিদার বাড়ী থেকে একটি দানাও ভিক্ষা পেলেন না। না পেয়ে বিফল মনোরথে বিষণ্ন বদনে ফিরে গেলেন তিনি। বৃদ্ধের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে দেবী লক্ষ্মী তাকে দর্শন দান করলেন এবং বিষণ্নবদনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন, বৃদ্ধ সবিস্তারে তা প্রকাশ করলো। দেবী মনে কষ্ট পেলেন। বৃদ্ধ ভিক্ষুকের মনোকষ্টের কারণে কুন্ডুরা পদ্মার ভাঙন কবলিত হয়ে তাঁদের অগাধ ধন সম্পত্তি আস্তে আস্তে খোঁয়াতে লাগলো।

বর্তমানে এ পরিবারের মূল বংশধরেরা ভারতে বাস করেন, কিন্তু এখনো তাদের বাড়িতে রয়েছে সেই শিলাটি–লক্ষ্মী-নারায়ণ।

*একটি রাজনগর রয়েছে ভারতের বীরভূম অঞ্চলে। এখানকার ঐতিহাসিক রাজ বাড়ী ও ইমামবাড়ি আজও স্বমহিমায় রয়েছে। এ অঞ্চলে

সেন বংশ, সিংহ বংশ ও পরে বীর বংশ রাজত্ব করে। এ গল্পের রাজনগর হয়তো বা এই রাজনগর'ই কিন্তু এর কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

।। ৬. দুবলহাটি জমিদার বাড়ি (নওগাঁ) ।।

নওগাঁ শহরের বালুডাঙ্গা থেকে হাপানিয়া থেকে খানিকটা এগিয়ে গেলে দেখা মিলবে বিশাল এলাকা নিয়ে ভগ্ন প্রায় একটি রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদ বলার কারণ এত বিশাল কলেবরের স্থাপত্যটির সাথে শুধুমাত্র ভাওয়ালগড়ের রাজবাড়িটিরই তুলনা দেওয়া চলে। জায়গাটি নওগাঁ শহর থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। একসময় এই বিস্তৃত এলাকাজুড়ে ছিল নদীনালা, বিল, আর ছিল গভীর জঙ্গল। তবুও এ জায়গায় বহু দূরদূরান্ত থেকে নৌকায় করে ব্যবসায়ি, ক্রেতা সবাই হাজির হতো বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে।

তেমনি বহুদিন আগে ভারতের উত্তর প্রদেশ থেকে জগৎরাম শেঠ নামে একজন গুড় ব্যবসায়ি বাণিজ্য করতে এই অঞ্চলে আসতেন। বিলগুলো ছিল ডাকাতদের আখড়া। শেঠ যাত্রাপথে বিশ্রাম নিতেন দুবলহাটির 'কয়রা নদীতে' (নদীটির অস্তিত্ব এখন আর নেই)। কেন জানি তার এই জায়গা ভারি আপন মনে হতো। একদিন জগৎরাম শেঠ বজরার নোঙ্গর ফেলেছেন কয়রা নদীতে। গভীর রাত। চারদিক সুনসান। বজরার সবাই ঘুমে কাদা। হঠাৎ জগৎরামের মনে হলো কেউ তাকে ডাকছে, 'শেঠ উদ্ধার করো আমাকে, প্রতিষ্ঠা করো আমাকে, তোমার মঙ্গল হবে।' জগৎরাম শেঠের ঘুম ভেঙে যায়, সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। মনে মনে ভাবলেন, সারাদিনের পরিশ্রমে বোধহয় এমন হয়েছে। পরেরদিন যথারীতি সবাই ঘুমিয়েছে। সেদিনও একই ঘটনা ঘটলো। কেউ যেন ডাকলো জগৎরামকে, ঘুমন্ত জগৎরামের ইন্দ্রিয়ও যেন আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে করেই হোক চোখ মেলবেন তিনি। একসময় চোখ খোলেন তিনি। যতদূর চোখ যায় দেখতে পান স্নিগ্ধ একটা আলোয় ছেঁয়ে আছে সামনের এক দেবীমূর্তি, মা দশভূজা রাজেশ্বরী দেবী। জগৎরামের কানে যেন কেউ ফিসফিস করে বলছে, 'তোমার বজরার নিচে পানিতে আমার মূর্তি আছে, আমাকে মুক্ত করো, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করো এই অঞ্চলে। তাতে তোমার মঙ্গল হবে।' আচমকা জগৎরাম দেখতে পান কোথাও কিছু নেই, সবকিছু আগের মতোই আছে।

পরের দিন সকাল হতে তিনি নিজেই নামলেন পানিতে। দেবীর কথা মতো পেলেন দশভূজা রাজেশ্বরীর মূর্তি।

এরপর জগৎরাম দূর্গার অষ্ট ধাতুর তৈরি একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। জঙ্গল পরিষ্কার করে গড়ে উঠলো গ্রাম। সেখানে জমিদারি পত্তন করলেন সেই ভারতের উত্তর প্রদেশের গুড় ব্যবসায়ি জগৎরাম শেঠ।

দেবী দশভূজার আশীবাদে বিত্ত বৈভবে অনন্য হয়ে উঠলো এই পরিবার। কিন্তু একদিন এই খবর পৌছালো মোগল দরবারে। চারদিকে বিল ঘেরা বলে কর ধার্য হলো মাত্র ২২ কাহন কৈ মাছ (১ কাহন = ১২৮ টি মাছ)। এমন কর ব্যবস্থা আর কোনো জমিদারিতে ছিল না বলেই মনে হয়।

।। ৭. লোহাগড় জমিদার বাড়ি (ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর) ।।

প্রায় দুইশত বছর আগে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জের চান্দ্রাবাজার থেকে দেড় কিলোমিটার দক্ষিণপশ্চিমের এক গ্রামের জমিদার ছিলেন রামমোহন রায়। তার ছিল দুই ছেলে মানিক সাহা (লোহ) ও রূপক সাহা (গহড়)। এই দুই ভাইয়ের নামে গ্রামটির নামকরণ করা হয় লোহাগড়। রামমোহন রায় অত্যাচারী ছিলেন, কিন্তু তার দুইপুত্র ছিল পিতার থেকে কয়েক কদম বাড়া। যেন সাক্ষাৎ যম। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর জমিদারি মিললো দুই ভাইয়ের। দুই সহোদর ভাইয়ে গলায় গলায় যেমন মিল, তেমনই ছিল তাদের নিষ্ঠুরতা আর দম্ভ। অথচ আজ তাদের তৈরি করা সুবিশাল প্রাসাদের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। দু'ভাই লোহাগড় মঠে তৈরি করিয়েছিল সাতটি সুউচ্চ স্তম্ভ যার তিনটি বর্তমানে অবশিষ্ট রয়েছে।

নানা ঘটনা ও কাজে দুই ভাই ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে রয়েছে। বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের কিছুদিন আগে তার বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ খাজনার টাকাপয়সা আত্মসাৎ করে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল এই জমিদারদের কাছেই।

ইতিহাসে কুখ্যাত লোহ ও গহড় দুই ভাইয়ের কিংবদন্তীতুল্য পৈচাশিকতা আজও এ অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে ফেরে। ঘটনাগুলো হয়তো সত্যি কিংবা সত্যির সাথে মিশ্রিত হয়েছে কারো কল্পনার কিংবদন্তী।

লোহাগড় জমিদার বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ডাকাতিয়া নদী। সেই সময় যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল খুবই খারাপ। সেই দুর্দশার কথা বলে শেষ হবে না। যা হোক, একদিন এক ইংরেজ সাহেব ঘোড়ায় চড়ে লোহাগড়ের দিয়ে কাজে চলছেন। রাস্তার বেহাল দশা দেখে সাহেব ভারী বিরক্ত হলেন। একটু চেঁচিয়ে বললেন, "এ কেমন জমিদার, রাস্তাঘাটের ঠিক নাই।" অত্যাচারীর

চাটুকারের অভাব হয় না। সাহেবের কটুক্তি লোহ-গহড় দুই ভাইয়ের কানে গেল। সাথে সাথে শুরু হলো রাস্তার কাজ। কথিত আছে, ইট-সুরকি নয়, বরং বস্তা ভর্তি সিঁকি আর আধুলি আসতে লাগলো রাস্তা তৈরি কাজে। কিছুক্ষণের মধ্যে নদীর ঘাট পর্যন্ত তৈরি হলো পয়সার রাস্তা। কাজ শেষে সাহেব যখন ফিরছেন ঘাটের দিকে, বিকেলের পড়ন্ত সূর্যের সোনালি আলো পয়সায় পড়ে সাহেবের চোখ ঝলসে দিলো। ইংরেজ সাহেব বলে কিন্তু রেহাই মিললো না তার। চাটুকারদের হাতে নানাভাবে সেদিন লাঞ্ছিত হলেন সেই ইংরেজ সাহেব।

আবার, নারীদের কাছে দুই জমিদার ছিল বিভীষিকার মতো। একদিন এক গর্ভবতী মহিলা জমিদার বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো। লোহ ও গহড় দুই ভাই ছিল প্রাসাদের অলিন্দে। হঠাৎ লোহ বলল, "দাদা, ঐ নারীর পেটে নিশ্চয় পুত্র সন্তান রয়েছে।" গহড় একটু ভালোভাবে খেয়াল করে বলল, "না ভাই, ওটি মেয়েই হবে।" দুই ভাইয়ের তর্কাতর্কি শেষে পরিণত হলো বাজিতে। সেপাইদের হুকুম দিলো, "ধরে নিয়ে আয় ওকে।" জমিদারের আদেশ অমান্য করার সাধ্য কার। সেপাইরা গিয়ে ধরে আনলো সেই হতভাগিনীকে। দু'ভাই হতভাগিনীর পেট একেবারে চিঁড়ে ফেললো। কথিত আছে, সেই মহিলার গর্ভে মেয়ে শিশু দেখে বাজি জেতার উল্লাসে ফেটে পড়েছিল গহড়।

লোহ আর গহড় যে শুধু তাদের এলাকাতেই অত্যাচারী ছিল তা কিন্তু নয়, অন্য এলাকার জমিদারদেরও নিস্তার মেলেনি তাদের হাত থেকে। সে সময়ে দুর্গাদি নামে ছিল আরেক অত্যাচারী জমিদার, যে নিজেকে মেঘনার পূর্ব পাড়ে সবচেয়ে শক্তিশালী জমিদার মনে বলে করতো। দুর্গাদির ছিল এক অনিন্দ্য সুন্দর যুবতী কন্যা। তার রূপের কথা লোহা ও গহড় দুই ভাইয়ের কানে পৌঁছুলো। দু'জনে ঠিক করলো জমিদার কন্যা বধূ হয়ে তাদের রাজগৃহে আসুক। বিয়ের প্রস্তাব গেল দুর্গাদির দরবারে, কিন্তু নিজে অত্যাচারী হলেও কন্যার মঙ্গল কে না চায়। দুর্গাদি সরাসরি না করে দিয়ে একপ্রকার গলা ধাক্কা দিয়েই বিদায় করলেন। লোহ ও গহড় একদিন সুযোগ বুঝে দুর্গাদির মেয়েকে তুলে নিয়ে এলো নিজেদের প্রাসাদে। অতঃপর নিজেদের লালসা মিটিয়ে মেয়েটিকে কেটে টুকরো টুকরো করে নদীর পানিতে ভাসিয়ে দিলো।

সে তো গেলো বাইরের মানুষের কথা। একদিন তাদের বিধবা মা আবদার করলেন আম দিয়ে দুধ খাওয়ার। দুই ভাই তৎক্ষণাৎ একটি বড় পুকুর খনন করালো, তারপর প্রজাদের হুকুম দিলো রাজ্যের সব আম আর

দুধ এনে এই পুকুর ভর্তি করতে। জমিদারদের ভয়ে প্রজারা পুকুর ভর্তি করতে লাগলো। পুকুর ভর্তি হলে মাকে নিয়ে এলো জমিদারেরা। সবাই কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক ধাক্কায় পুকুরে গিয়ে পড়লো তাদের জন্মদাত্রী। মায়ের অপরাধ ছিল সামান্য দুধ আর আম খেতে চেয়েছিল।

বৃদ্ধা কিছুক্ষণ নাকানি চুবানি খেয়ে অবশেষে প্রাণ হারালো। নিষ্ঠুর দুই ভাই অট্টোহাসিতে ফেটে পড়লো।

আজ প্রাসাদ নেই ঠিকই রয়ে গেছে সেই পুকুরটি। পুকুরটির পানি স্বচ্ছ নীল। পুকুরটির একটি বিশেষত্ব হলো এটি সাধারণ পুকুরের মতো গোলাকার নয়। ১২ ফুট চাওড়া ঘাটের আয়তাকার পুকুরটির পাড়গুলো মসৃণ। ঘাটের নিচ বরাবর ভালো মতো খেয়াল করলে বোঝা যায় তল থেকে উঁকি দেয়া লাল ইট ও কংক্রিটের আচ্ছাদন।

লাঙ্গলবন্দের কিংবদন্তী

ত্রেতাযুগের সূচনালগ্নে মগধ ছিল সেই সময়কার সমৃদ্ধশালী রাজ্যগুলোর একটি। তৎকালীন এই মগধ রাজ্যের মধ্য দিয়েই প্রবাহমান ছিল ভাগীরথীর উপনদী কৌশিকী। কৌশিকী নদীর তীর ঘেঁষে ছিল এক সমৃদ্ধ নগরী, নাম ভোজকোট। এই নগরীতেই সূর্যবংশীয় কন্যা রেণুকাকে নিজ পত্নীরূপে গ্রহণ করে বসবাস করছিল ঋষি জমদগ্নি। তাদের ঘর আলো করে একে একে আসে পাঁচ পুত্র–রুষন্ত, সুষেণ, বসু, বিশ্বাসুর ও পরশুরাম। এই পাঁচ পুত্রের মধ্যে ভৃগুনন্দন পরশুরাম ছিল পঞ্চম তথা সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। হিন্দু পুরাণ মতে যিনি ছিলেন বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। পূর্বজন্মের তপস্যার দ্বারাই বিষ্ণু অবতার পরশুরামকে তাঁর পিতামাতা তাঁকে নিজ সন্তানরূপে লাভ করার বিরল সম্মানটি অর্জন করেন।

কথিত আছে, একবার পরশুরামের মাতা রেণুকা গঙ্গার তীরে যান পানি সংগ্রহের জন্য। সেই সময় ওখানে পদ্মমালী নামক গন্ধবরাজ নিজ স্ত্রীকে সাথে নিয়ে জলবিহারে মত্ত ছিলেন। এক্ষেত্রে ভিন্ন মতও রয়েছে। এমটাও শোনা যায়, গন্ধবরাজ নয়, বরং চিত্ররথকে অপ্সরাদের সাথে জলবিহার করতে দেখেছিলেন তিনি। তবে পদ্মমালী বা চিত্ররথ যেই হোক না কেন, রেণুকাকে তার রূপ এবং তাদের সমবেত জলবিহার ভীষণভাবে মোহিত করে। আশ্রমবাসিণী রেণুকা জলবিহার দেখে কামস্পৃহ হয়ে পড়েন। তিনি সেদিকে তাকিয়ে থাকেন এবং তাদের জলবিহার উপভোগ করতে থাকেন আড়াল থেকে। অন্যদিকে ঋষি জমদগ্নির হোমবেলা যে পেড়িয়ে যাচ্ছিল সেকথা তিনি একেবারেই ভুলে যান। যতক্ষণে রেণুকা সম্বিৎ ফিরে পায় ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তিনি দ্রুত জলপাত্রে জল ভরে নিয়ে পা বাড়ান আশ্রমের দিকে।

রেণুকা যখন আশ্রমে উপস্থিত হোন, তাকে দেখে ঋষি জমদগ্নি নিজের তপস্যাবলে সবকিছু জানতে পেরে যান। নিজের স্ত্রীর এমন আচরণ তাঁকে ভীষণ ক্রোধান্বিত করে তোলে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তিনি তাঁর পুত্রদেরকে নির্দেশ দেন তাদের মাতা রেণুকাকে হত্যার। কিন্তু একে একে প্রথম চারপুত্রের প্রত্যেকেই মাতৃহত্যার মহাপাপের দায় নিজ কাঁধে তুলে নিতে

অস্বীকৃতি জানায়। এতে করে জমদগ্নির ক্রোধ গিয়ে পড়ে তার পুত্রদের ওপর। তিনি একে একে চার পুত্রের সবাইকেই হত্যা করেন। সবশেষে তিনি সর্বকনিষ্ঠ পরশুরামকে আদেশ দেন রেণুকার শিরচ্ছেদ করার। পিতার এমন আদেশ পরশুরামকে বিচলিত করে। একরকম উভয় সংকটের মধ্যে নিমজ্জিত হয় শিবভক্ত পরশুরাম–পিতার আদেশ অমান্য করবে নাকি মাতৃহত্যার দায় মাথায় তুলে নেবে?

এমতাবস্থায় পরশুরাম তার মায়ের কাছে গিয়ে পুরোটা খুলে বলেন। সবটা শোনার পর পরশুরামের মাতা, সত্যপরায়ণা রেণুকা তাঁর পুত্রকে আদেশ দেন পিতার নির্দেশ রক্ষা করার। সব কষ্ট বুকে চেপে রেখে পরশুরাম সেটাই করলো–কুঠার দিয়ে মায়ের শিরচ্ছেদ। কনিষ্ঠপুত্র পরশুরাম কর্তৃক জমদগ্নির আদেশ প্রতিপালিত হলে তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে বর চাইতে বলেন। পরশুরাম তখন জমদগ্নির কাছে তার মাতা ও ভ্রাতার প্রাণ বর চান। ঋষি জমদগ্নি সেটাই করলেন। কিন্তু মাতৃহত্যার মতো মহাপাপের দায় তার মাথায় লেগে যায়। ফলে তিনি যে কুঠারটি দিয়ে মায়ের শিরচ্ছেদ করেছিলেন, সেটি তার হাতের মধ্যে এঁটে যায়। শত চেষ্টা করেও কোনোভাবেই কুঠারটিকে হাত থেকে আলাদা করতে পারলো না। তখন তিনি পিতার পরামর্শক্রমে তীর্থে তীর্থে ঘুরতে শুরু করেন। সবশেষে স্বীয় আরাধনার বলে শিবকে সন্তুষ্ট করেন এবং তাঁর কাছ থেকে পাপ মোচনের পথটি জেনে নেন। এবার তিনি যাত্রা করেন হিমালয়ের উদ্দেশ্যে। কেননা দেবতা ব্রহ্মপুত্র তখন হিমালয়ের বুকে হ্রদরূপে লুকিয়ে ছিলেন। শিবের কাছ থেকেই ব্রহ্মপুত্রের মাহাত্ম্যের কথা জানতে পারেন পরশুরাম। শিব তাকে বলেন, ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নান করলেই পরশুরামের পাপ মুক্তি ঘটবে।

হিমালয়ে পৌঁছনোর পর পরশুরাম লুকায়িত ব্রহ্মপুত্রকে খুঁজে বের করেন এবং তার কাছে প্রার্থনা করেন সে যেন তাকে নিজের জলে স্নান করে পাপ থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ দেন। পরশুরামের এই প্রার্থনা ব্রহ্মপুত্র গ্রহণ করলে তার জলে স্নান করতে নামেন পরশুরাম। তখনই ঘটে বিস্ময়কর ঘটনাটি। শত চেষ্টা করেও যে কুঠারটি তিনি নিজের হাত থেকে আলাদা করতে পারছিলেন না, সেই কুঠারটি আপনাআপনিই তার হাত থেকে খসে পড়ে। এভাবেই মাতৃহত্যার পাপ থেকে মুক্তি লাভ করেন পরশুরাম। যে তিথিতে ব্রহ্মপুত্রের জলে পরশুরাম স্নান করেছিলেন, সেটি ছিল চৈত্রের অষ্টমী।

ব্রহ্মপুত্রের এরূপ ক্ষমতা পরশুরামকে পুলকিত করে। তিনি মনে মনে ঠিক করেন, নদের পাপহরণ ক্ষমতাসম্পন্ন জল যেন সাধারণ মানুষের

উপকারে আসে তেমন ব্যবস্থাই গ্রহণ করবেন তিনি। যেই ভাবা, সেই কাজ। নিজের কুঠারটিকে তিনি লাঙ্গলের ফলায় বেঁধে ভূমি কর্ষণ শুরু করেন। হিমালয় থেকে এগোতে থাকে সমভূমির দিকে। ভূমি কর্ষণের ফলে সৃষ্টি হয় নালা। এই নালা ধরেই সমতলে নেমে আসে পবিত্র ব্রহ্মপুত্র। দীর্ঘসময় ও পথ পার করে পরশুরামের লাঙ্গলের ভূমি কর্ষণ যেখানে এসে বন্ধ হয়েছিল বলে বিশ্বাস করা হয়, সেই জায়গাটির নাম–লাঙ্গলবন্ধ। এ জায়গাটির বর্তমান অবস্থান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে ২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কোল ঘেঁষে। এখনো প্রতি বছর চৈত্রের অষ্টমী তিথিতে এখানে হাজারও হিন্দুধর্মাবলম্বীর আগমণ ঘটে।

এখন হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে, পাপ মোচনের অলৌকিক ক্ষমতা আছে যে নদীর, সেখানে কেন অষ্টমী তিথিতেই ভক্তদের আগমন ঘটে? এ নিয়েও প্রচলিত রয়েছে একটি কিংবদন্তী।

কথিত আছে, হিমালয় থেকে ব্রহ্মপুত্র নদকে মানব কল্যাণে কাজে লাগাতে সমভূমিতে নিয়ে আসার পর পরশুরাম নদটির মাহাত্ম্য প্রচারে বেরিয়ে পড়েন। বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণ করে নদের শক্তির কথা প্রচারে তিনি যখন ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁর অজ্ঞাতে ঘটে আরেকটি ঘটনা। পরশুরাম যেখানে এসে ভূমি কর্ষণ বন্ধ করেছিলেন, সেই জায়গার কাছেই বয়ে চলছিল সুন্দরী নদী শীতলক্ষ্যা। শীতলক্ষ্যার রূপের কথা ব্রহ্মপুত্রের কানে পৌঁছলে শক্তিশালী ব্রহ্মপুত্র প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হতে থাকে তার দিকে। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে ভয় পেয়ে যায় শীতলক্ষ্যা। নিজের সমস্ত সৌন্দর্য আড়াল করে সে। ধারণ করে এক বৃদ্ধার বেশ। নিজেকে উপস্থাপন করেন বুড়িগঙ্গারূপে। এদিকে বুড়িগঙ্গারূপী কুৎসিত শীতলক্ষ্যার চেহারা ব্রহ্মপুত্রকে ভীষণ মর্মাহত করে। কিন্তু দৈব বলে আসল ঘটনা উদঘাটনে সফল হলে শীতলক্ষ্যার অবগুণ্ঠন সরিয়ে দেয় ব্রহ্মপুত্র। শীতলক্ষ্যার রূপ তাকে মুগ্ধ করে। দুজনে তখন মিলিত হোন। দুজনের মিলিত স্রোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে একসাথে।

পরশুরাম তীর্থযাত্রা শেষে ফিরে এসে যখন এসব দেখলেন, তখন ভীষণ মনঃক্ষুণ্ন হলেন। ধারণা করা হয়, পরশুরাম ব্রহ্মপুত্র নদকে জগতের পবিত্রতম ও শ্রেষ্ঠ নদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাদের দু'জনকে অভিশাপ দেন। ব্রহ্মপুত্রকে অভিশাপ দিয়ে বলেন, সে তার অলৌকিক ক্ষমতা হারাবে। তখন পরশুরামকে পূর্বের উপকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ব্রহ্মপুত্র। মাতৃহত্যার মতো মহাপাপের চিহ্ন হিসাবে পরশুরামের হাতের মধ্যে যখন কুঠার এঁটে যায়, তখন ব্রহ্মপুত্রই তাকে কৃপা করেছিল

মুক্তি লাভে। সেই উপকারের খাতিরে পরশুরামের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো ব্রহ্মপুত্র। পরশুরামের মনে তখন দয়ার জন্ম নেয়। তিনি তখন ব্রহ্মপুত্রের উদ্দেশ্যে বলেন যে, "ব্রহ্মপুত্রের অলৌকিক ক্ষমতা থাকবে না কিন্তু যেহেতু সে পরশুরামকে পাপ থেকে মুক্তি পেতে সহায়তা করেছিল, তাই বছরের একটি দিন সে তার দৈব ক্ষমতাটি ফিরে পাবে। আর সেই দিনটি হলো চৈত্রের অষ্টমী তিথি।"

এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই চৈত্রের অষ্টমী তিথিতে লাঙ্গলবন্দে স্নান করতে আসে অসংখ্য হিন্দুধর্মাবলম্বী।

এখন হয়তো পাঠকদের মনে কৌতূহল জাগতে পারে, ব্রহ্মপুত্রের এই অলৌকিক ক্ষমতার পেছনের উৎস কী? আরেকটা কিংবদন্তী বলছে, একবার ব্রহ্মার এক পুত্র একবার অভিশপ্ত হয়ে নদ রূপ ধারণ করেছিল। ব্রহ্মার পুত্র থেকে নদের উৎপত্তি বলেই এই নদেরই নাম ব্রহ্মপুত্র হয়েছিল এমনটাই বিশ্বাস করা হয়। ব্রহ্মার সেই অভিশপ্ত পুত্রের নদী জীবন সার্থক হয়। শিব তাকে বেছে নেন মানবকল্যাণে কাজে লাগানোর জন্য। এখানে পরশুরাম ছিল এক নিমিত্ত মাত্র।

কার্ল লায়ন অসুস্থ। শীঘ্রই সে মারা যাবে। তার প্রাণপ্রিয় বড়োভাই জোনাথান তাকে সান্ত্বনা দিতে এক স্বপ্নপুরীর গল্প শোনায়– নাঙ্গিয়ালা। কার্ল মারা গেলে সেই স্বপ্নের দেশে যাবে। কার্ল মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে সে গল্প।

দূর্ভাগ্যক্রমে এক দুর্ঘটনায় জোনাথান মারা যায়। এই আকস্মিক বিচ্ছেদ মেনে নিতে পারে না কার্ল। তার মৃত্যুর পর সে বেরিয়ে পড়ে নাঙ্গিয়ালার উদ্দেশ্যে; লক্ষ্য ভাইয়ের সাথে দেখা করা। কিন্তু অনিন্দ্যসুন্দর নাঙ্গিয়ালাকে কুক্ষিগত করতে চায় এক অত্যাচারী শাসক টেঙ্গিল; সাথে আছে এক ভয়ংকর ড্রাগন– কাটলা। কার্ল কি পারবে জোনাথানকে এই যুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করতে?

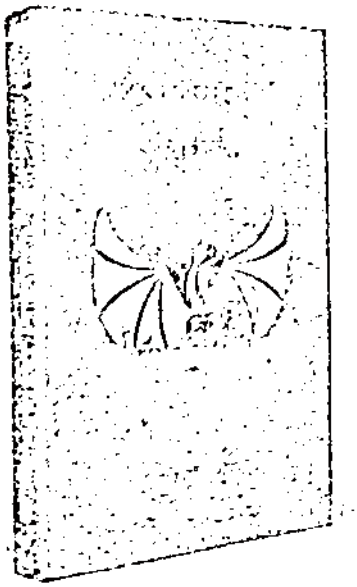

গল্পটি রোগ, মৃত্যু, স্বৈরশাসন, বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের।

গল্পটি দুই ভাইয়ের "লায়ন" পদবী থেকে "লায়নহার্ট" হয়ে ওঠার। এই দুই ভাইয়ের স্বর্গীয় ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা, আশা ও সাহসিকতা দেখার জন্য আপনারা আমন্ত্রিত।

বই	: দ্য ব্রাদার্স লায়নহার্ট
লেখক	: অ্যাস্ট্রিড লিন্ডগ্রেন
অনুবাদক	: জাকির হোসেন
ধরন	: শিশুতোষ অ্যাডভেঞ্চার

কিংবদন্তী কী? কিংবদন্তী হচ্ছে মানুষের মুখে মুখে বহুকাল ধরে চলে আসছে এমন সব গল্প বা জনশ্রুতি। কিন্তু, কিংবদন্তী কি কেবলমাত্র গল্প বা মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত জনশ্রুতি? এক্ষেত্রে একটা প্রশ্নবোধক থেকেই যায়...কারণ অনেকক্ষেত্রে ইতিহাসের উৎস হিসাবে রসদ যোগায় এই কিংবদন্তী। আবার একে অবহিত করা যায় প্রাচীন সমাজের সম্পদ বলেও। তবে কিংবদন্তীকে পুরোপুরি ইতিহাসও বলা চলে না। সত্য ও কল্পনা–এ দুইয়ের মিশ্রণে সৃষ্টি হয় কিংবদন্তীর।

ইতিহাস যেখানে এসে মৌন হয়ে যায়, কিংবদন্তী সেখানে সরব হয়ে ওঠে। এটি হতে পারে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, দেবদেবী কেন্দ্রিক, মেলা অথবা হতে পারে দিঘি কেন্দ্রিক।

এর মূলধারা হলো–কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের মেধা বা কল্পনায় প্রসবণ হয় না। বরং যুগ যুগ ধরে এটি ঘুরেফিরে সাধারণ মানুষের মুখে। হয়তো কেউ শুনেছে তার দাদার কাছে, তার দাদা শুনেছে তার পরদাদার কাছে–এভাবেই একসময় তা ঠাঁই করে নিয়েছে জনমনে। আবার কখনও কখনও পরিণত হয়েছে বিশ্বাসে।

কিংবদন্তীর গল্পগুলো কখনও স্বতন্ত্র, আবার কখনও প্রায় একই ধাঁচের। এসবের দায় পড়ে তৎকালীন আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মবিশ্বাস, এমনকি রাজনীতির ওপরেও। আবার, এমনও ঘটতে দেখা যায়–কালের পরিক্রমায় একই নাম, একই ঘটনা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে; কখনও বা দেশের সীমান্ত ছাড়িয়ে বিস্তৃতি পায় ভিনদেশেও; কখনও বা এর উৎসকে আলাদা করে চিহ্নিত করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

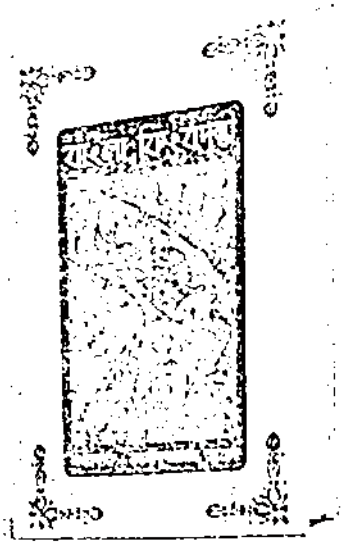

এমনই সব গল্প বা জনশ্রুতি, যা বহুকাল ধরে আমাদের দেশের মানুষের মুখে মুখে চলে আসছে, সেসব গল্পের সামান্য কতক একত্রিত করার ছোট্ট একটি চেষ্টা করা হয়েছে "বাংলা কিংবদন্তী" বইটিতে।

বই	: বাংলা কিংবদন্তী
সংকলক	: আসাদুজ্জামান জুয়েল
ধরন	: কিংবদন্তী সংকলন